দৈত্যের কেটলি

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

দৈত্যের কেটলি

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

ছবি ঃ নারায়ণ দেবনাথ

প্রকাশক ঃ এন সাহা

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৭

মুদ্রক ঃ অজিতকুমার সামই। ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১।১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট। কলিকাতা-৬

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ ন্যাশনাল হাফটোন কোম্পানী

৬৮, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট। কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান ঃ নির্মল পুস্তকালয়

১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-১২

দাম— টাকা

উপহার

যা আছে
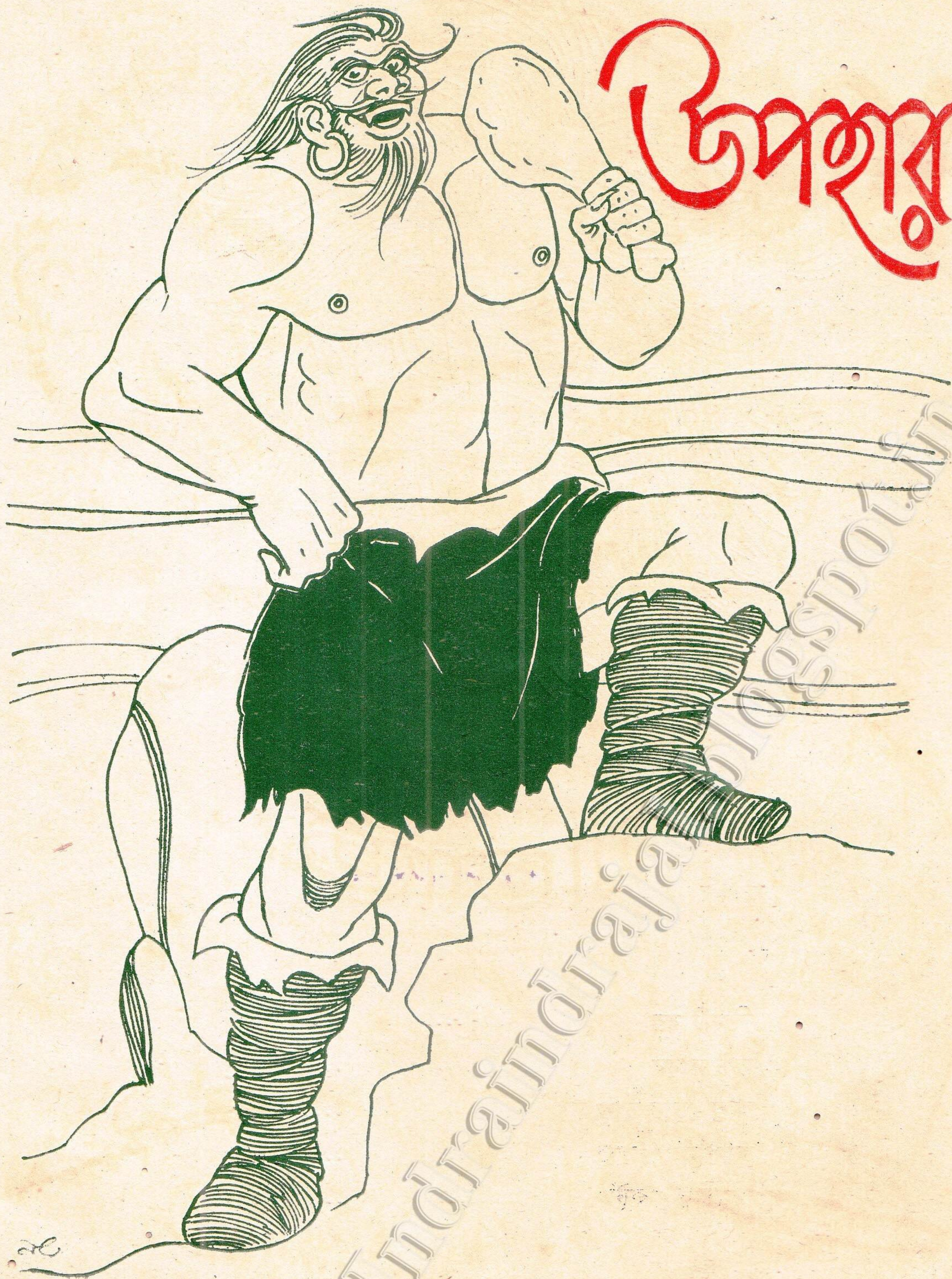
তিনটি বর

এক দেশে এক কামার ছিলো, তার মতো অভাগা আর কোনো দেশে কখনো জন্মায় নি। তাকে এক জিনিস গড়তে দিলে তার জায়গায় আর-এক জিনিস গড়ে রাখতো; একটা কিছু সারাতে দিলে তাকে ভেঙে আরো খোঁড়া ক'রে দিতো। আর লোককে ফাঁকি যা দিতো, সে কী বলবো! কাজেই কেউ তাকে কোনো কাজ করতে দিতে চাইতো না। তার দু'বেলা দু'টি ভাতও জুটতো না। লাভের মধ্যে সে তার গিন্নীর তাড়া খেয়ে সারা হ'তো।
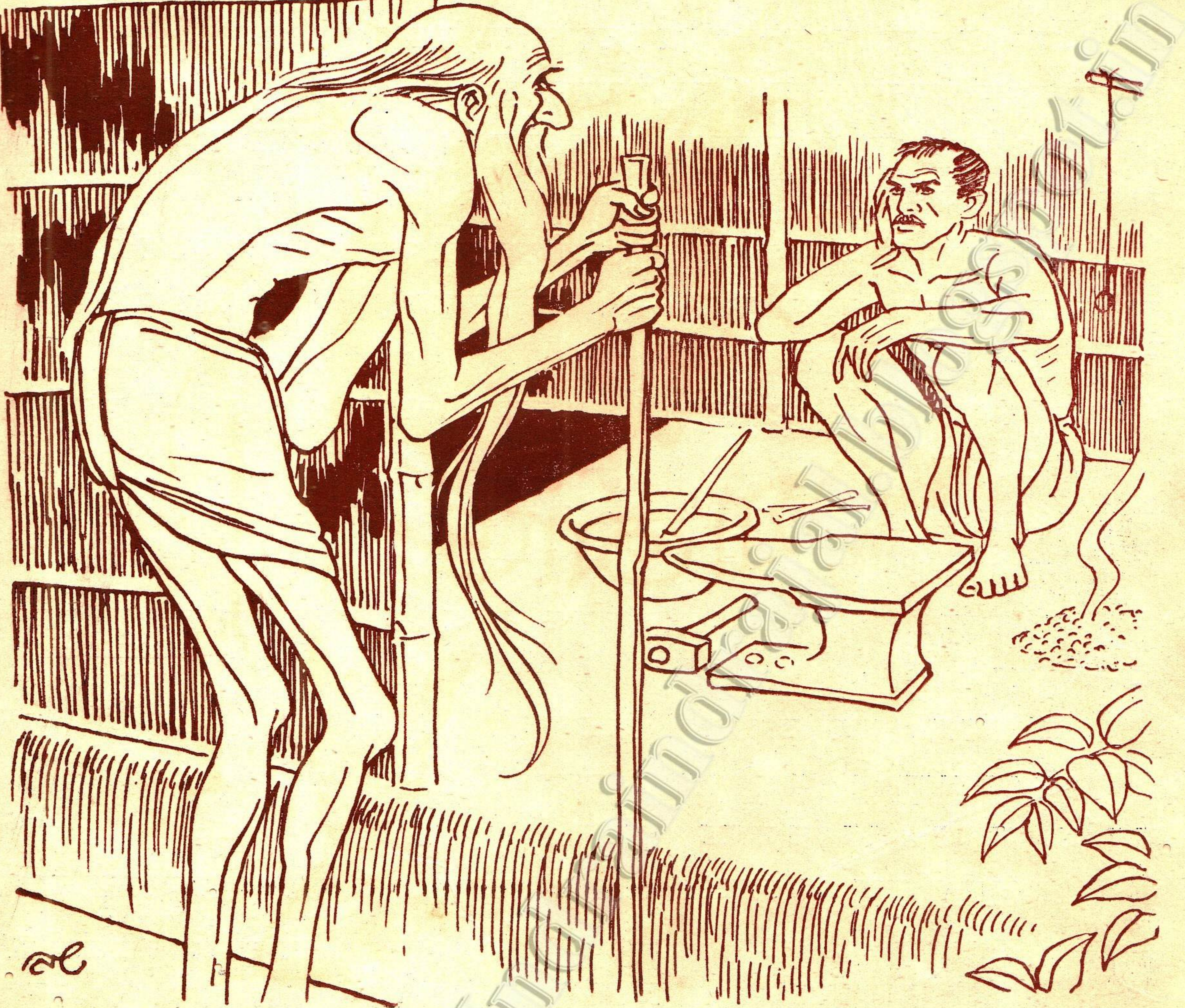
একদিন সে দোকানে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছে। ভয়ানক শীত ; গায়ে জড়াবার কিছু নেই। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে ; ঘরে খাবার নেই। এমন সময় কোত্থেকে এক ইয়া লম্বা লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো লাঠিতে ভর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে এসে তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, 'জয় হোক বাবা, দুঃখী বুড়োকে কিছু খেতে দাও।'

কামার বললো, 'বাবা, খাবার যদি থাকতো, তবে নিজেই দু'টি খেয়ে বাঁচতুম। দু'দিন পেটে কিছু পড়ে নি, ছেলেপুলে নিয়ে উপোস করছি—তোমাকে কোত্থেকে খেতে দেবো ? তুমি না হয় ঘরে এসে একটু গরম হয়ে যাও, আমি হাপর ঠেলে আগুনটা উস্‌কিয়ে দিচ্ছি।'

বুড়ো তখন কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এসে বললো, 'আহা, বাঁচালে বাবা ; শীতে জমে গিয়েছিলুম। তুমি দেখছি তবে আমার চেয়েও দুঃখী। আমার নিজে খেতে পেলেই চলে, তোমার আবার স্ত্রী আর ছেলেপুলেও আছে।'

এই বলে বুড়ো আগুনের কাছে এসে বসলো, কামার খুব করে হাপর ঠেলে আগুন উস্‌কিয়ে তাকে গরম করে দিলো। যাবার সময় বুড়ো তাকে বললো, 'তুমি আমাকে খেতে দিতে পারো নি, তবু তোমার যতোদূর সাধ্যি তুমি করেছো। এখন তোমার যেমন ইচ্ছে তিনটি বর চাও, আমি নিশ্চয় দেবো।'

এ কথায় কামার অনেকক্ষণ বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে মাথা চুলকোতে লাগলো, কিন্তু কী বর চাইতে হবে, বুঝতে পারলো না। বুড়ো বললো, 'শীগ্‌গির বলো ; আমার বড্ড তাড়াতাড়ি—ঢের কাজ আছে।'

তখন কামার থতমত খেয়ে বললো, 'আচ্ছা, তবে এই বর দিন যে, আমার এই হাতুড়িটি যে একবার হাতে করবে, সে আর আমার হুকুম ছাড়া সেটি রেখে দিতে পারবে না। আর যদি তা দিয়ে ঠুকতে আরম্ভ করে, তবে আমি থামতে না বললে আর থামাতে পারবে না।'

বুড়ো বললো, 'আচ্ছা, তাই হবে। আর কী বর চাই ?'

কামার বললো, 'আমার এই কেদারাখানিতে যে বসবে, সে আমার হুকুম ছাড়া তা থেকে উঠতে পারবে না।'

বুড়ো বললো, 'আচ্ছা, তাও হবে। আর কী ?'

কামার বললো, 'আমার এই থলেটির ভিতরে আমি কোনো টাকা রাখলে আমি ছাড়া আর কেউ সেটা তা থেকে বার করতে পারবে না।'

সেই বুড়ো ছিলেন এক দেবতা। তিনি এই শেষ বরটিও কামারকে দিয়ে ভয়ানক রেগে

বললেন, 'অভাগা, তুই ইচ্ছে করলে এই তিনটি বরে পরিবার-সুদ্ধ স্বর্গে চলে যেতে পারতিস, তার মধ্যে তোর এই দুর্মতি !'

এই বলে দেবতা চলে গেলেন। কামার আবার বসে বসে ভাবতে লাগলো। হঠাৎ তার মনে হলো যে, তাই তো, এই তিন বরের জোরে তো আমি বেশ দু'পয়সা রোজগার ক'রে নিতে পারি।

তখন সে দেশময় এই কথাই রটিয়ে দিলো যে, 'আমার দোকানে এলে আমি বিনি পয়সায় কাজ ক'রে দেবো।'

দেশের যতো কিপ্‌টে পয়সাওয়ালা লোক, সে-কথা শুনে তার দোকানে এসে উপস্থিত হতে লাগলো। এক-একজন আসে, আর কামার তাকে দু'হাতে লম্বা লম্বা সেলাম ক'রে তার সেই কেদারাখানায় নিয়ে বসতে দেয়। বিনি পয়সায় কাজ করিয়ে চলে যাবার সময় আর সে বেচারা তা থেকে উঠতে পারে না, কামারও বেশ ভালোমতো তার কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় না ক'রে তাকে উঠতে দেয় না। এমনি ক'রে দিনকতক সে খুব টাকা পেতে লাগলো। কাউকে এনে চেয়ারে বসায়, কারু হাতে তার হাতুড়িখানা তুলে দেয়, তারপর টাকা না দিলে আর তাকে ছাড়ে না।

যা হোক, ক্রমে সকলেই তার দুষ্টুমি টের পেয়ে ফেললো ; তখন আর কেউ তার কাছে আসে না, কাজেই আবার তার দুর্দশার একশেষ হতে লাগলো।

এই সময় কামার একদিন একটা বনের ভেতর বেড়াতে গিয়ে একটি সাদাসিধে গোছের বুড়োকে দেখতে পেলো। বুড়োকে দেখে সে আগে ভাবলো, বুঝি কোনো উকিল হবে। কিন্তু তখনই আবার কোনো উকিলের সেই বনের ভিতর আসা তার ভারী অসম্ভব মনে হলো। তারপর সে আবার ভালো ক'রে চেয়ে দেখলো যে, সেই লোকটার পা দু'খানিতে ঠিক ছাগলের পায়ের মতো খুর আছে। তখন আর বুঝতে বাকী রইলো না যে সেই বুড়ো আর কেউ নয়, স্বয়ং শয়তান। শয়তানের পা ঠিক ছাগলের মতো হয়ে থাকে, এ কথা সেই কামার ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছিলো।

আর কেউ হলে তখনই সেখান থেকে ছুটে পালাতো। কিন্তু সেই কামার তেমন কিছু না ক'রে জোড় হাতে শয়তানকে নমস্কার ক'রে বললো, 'প্রণাম হই !'

শয়তান অমনি হাসতে হাসতে বললো, 'কী হে, কেমন আছো ?'

কামার বললো, 'আজ্ঞে, কেমন আর থাকবো ? দু'বেলা দু'টি ভাতও খেতে পাইনে।'

শয়তান বললো, 'বটে! তুমি এতোই কষ্ট পাচ্ছো? তুমি কেন আমার চাকরি করো না? আমি তোমাকে ঢের টাকা দেবো।'

ঢের টাকার নাম শুনে কামার তখনই শয়তানের কথায় রাজী হ'লো, যদিও সে জানতো যে, তার কাজে একবার ঢুকলে আর কেউ ছেড়ে আসতে পারে না। শয়তান তখন তাকে তিন

থলি মোহর দিয়ে বললো, 'এখন গিয়ে এই টাকা দিয়ে খুব আরামে খাও-দাও ; সাত বছর পরে আমি তোমার কাছে আসবো, তখন তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

এই বলে শয়তান চলে গেলো। কামারও হাসতে হাসতে টাকার থলি নিয়ে ঘরে ফিরলো।

সেই তিন থলি মোহর নিয়ে কামার যারপরনাই খুশি হয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি এলো। ভাবলো, এখন সাত বছর এই মোহর দিয়ে খুব ধুমধাম ক'রে নেবে। সাত বছর পরে শয়তানের তাকে নিতে আসবার কথা, তখন তার সঙ্গে যেতেই হবে।

তারপর লোকে দেখলো যে, কামার কেমন ক'রে রাতারাতি বড়োলোক হয়ে গেছে। এখন আর সে হাপরও ঠেলে না, লোহাও পেটে না ; এখন তার গাড়িঘোড়া চাকরবাকরের অন্তই নেই। দিন যাচ্ছে আর তার বাবুগিরি ক্রমেই বেড়ে উঠছে। বাবুগিরিতে সাত বছর শেষ হবার ঢের আগেই শয়তানের দেওয়া সব টাকা ফুরিয়ে গেলো, আর ঘরে একটি পয়সাও নেই, একমুঠো চালও নেই। তখন কাজেই তাকে আবার যে কামার সেই কামারই হ'তে হ'লো, নইলে খাবে কী ?

তারপর একদিন সে তার দোকানে বসে একটা লোহা পিটছে আর ভাবছে, কখন খদ্দের আসবে, এমন সময় একজন বুড়ো-হেন লোক ধীরে ধীরে এসে তার কাছে দাঁড়ালো। কামার আগে ভাবলো, এই রে, খদ্দের ! তারপর চেয়ে দেখলো, ওমা ! এ যে শয়তান !

শয়তান বললো, 'মনে আছে তো ? সাত বছর শেষ হয়েছে, এখন আমার সঙ্গে চলো।'

কামার বললো, 'তাই তো, আমি গেলে আমার ছেলেপুলেগুলো কী খাবে ? তোমার তো কতোই লোক আছে, আমাকে দয়া ক'রে ছেড়ে দাও।'

শয়তান বললো, 'সে হবে না ! আমাকে ফাঁকি দেওয়া বড়ো শক্ত কাজ ; চলো, এখনই চলো।'

কামার বললো, 'তুমি ছাড়বেই না যখন তখন তো চলতেই হবে, কিন্তু আমার হাতের এই কাজটি শেষ করে যেতে পারলে আমার ছেলেগুলোর পক্ষে বড়ো ভালো হ'তো—এর দরুন কিছু পয়সা পাওয়া যাবে। তুমি আমার এই উপকারটুকু করো না—আমি সকলের কাছে বিদায় হয়ে নিই, ততোক্ষণ তুমি বসে এই হাতুড়িটা দিয়ে এই লোহাখানিকে পেটো।'

শয়তান কাজে দুষ্টু হলেও কথাবার্তায় ভারী ভদ্রলোক, সে কামারের কথা শুনে তখনই তার হাত থেকে হাতুড়িটি নিয়ে লোহাটাকে পেটাতে লাগলো। সে জানতো না যে, সেটা

সেই দেবতার বর-দেওয়া সর্বনেশে হাতুড়ি, তা দিয়ে একবার পিটতে আরম্ভ করলে আর কামারের হুকুম ছাড়া থামবার উপায় নেই। কামার তার হাতে সেই হাতুড়িটি দিয়েই অমনি যে ঘর থেকে বেরুলো, আর এক মাসের ভিতরে সে-মুখোই হ'লো না।

এক মাস পরে কামার দোকানে ফিরে এসে দেখলো যে, শয়তান তখনও ঠনাঠন ঠনাঠন ক'রে বেদম হাতুড়ি পিটছে, আর তার দশা যা হয়েছে! খালি শয়তান বলে সে এতোদিন বেঁচে আছে, আর কেউ হলে মরেই যেতো। কামারকে দেখে সে অনেক মিনতি ক'রে বললো, 'ভাই, ঢের তো হয়েছে; আমাকে মেরে ফেলে তোমার লাভ কী? তার চেয়ে তোমাকে আরও তিন থলি মোহর দিচ্ছি, আরও সাত বছরের ছুটি দিচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দাও।'

কামার ভাবলো মন্দ কী! আরও তিন থলি মোহর দিয়ে সাত বছর সুখে কাটানো যাক। কাজেই সে শয়তানকে বললো, 'আচ্ছা, তবে তাই হোক।'

তখন শয়তান কামারকে আবার তিন থলি মোহর দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেলো, কামারও সেই টাকা দিয়ে আবার বেজায় ধুমধাম জুড়ে দিলো। তারপর সে টাকা শেষ হতেও আর বেশী দেরী হ'লো না, তখন আর হাতুড়ি-পেটা ভিন্ন উপায় নেই। এমনি ক'রে আবার সাত বছর কেটে গেলো।

এবার শয়তান কামারকে নিতে এসে দেখে—তার বাড়িতে ভারী গোলমাল। কী কথা নিয়ে কামার তার গিন্নীর উপর বিষম চটে গেছে, আর তাকে ধরে ভয়ানক মারছে। কামারের গিন্নীও যেমন-তেমন মেয়ে নয়, পাড়ার সকলে তার জ্বালায় অস্থির। কামারকেও সে ঝাঁটা দিয়ে কম নাকাল করছে না, কিন্তু কামারের হাতে কিনা হাতুড়ি, কাজেই জিত্ হচ্ছে তারই। শয়তান এসে এসব দেখে কামারকে ভয়ানক দুই থাপ্পড় লাগিয়ে বললো, 'বেটা পাজি, স্ত্রীকে ধরে মারিস! চল্, আমার সঙ্গে চল্!'

শয়তান ভেবেছিলো, এতে কামারের স্ত্রী খুব খুশি হয়ে তাকে সাহায্য করবে। কিন্তু কামারের স্ত্রী সে-সব কিছু না ক'রে, 'বটে রে হতভাগা, তোর এতোবড়ো আস্পর্ধা! আমার স্বামীর গায়ে হাত তুলেছিস!' বলে, সেই ঝাঁটা দিয়ে শয়তানের নাকে মুখে এমনি সপাংসপ মারতে লাগলো যে বেচারার দমই ফেলা দায়। সে তাতে বেজায় থতমত খেয়ে একটা চেয়ারের উপরে বসে পড়লো—সেই চেয়ার, যাতে একবার বসলে আর বিনা হুকুমে উঠবার জো নেই।

কামার দেখলো যে শয়তান এবারে বেশ ভালোমতোই ধরা পড়েছে, হাজার

টানাটানিতেও উঠতে পারছে না। তখন সে তার চিমটেখানি আগুনে তাতিয়ে নিয়ে তা দিয়ে আচ্ছা ক'রে তার নাকটা টিপে ধরলো। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে 'হেইয়ো' বলে সেই চিমটে ধরে টানতেই নাকটা রবারের মতো লম্বা হ'তে লাগলো। এক হাত, দু' হাত, চার হাত, আট হাত—নাক যতোই লম্বা হচ্ছে, শয়তান বেটা ততোই ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে। নাকটা যখন কুড়ি হাত লম্বা হ'লো তখন শয়তান আর থাকতে না

পেরে নাকী স্বরে বললো, 'দোহাই তোমাদের! আর টেনো না, মরে যাবো!'

কামার বললো, 'আরও তিন থলি টাকা, আর সাত বছরের ছুটি দেবে কিনা বলো।'

শয়তান ব্যস্ত হয়ে বললো, 'এক্ষুনি, এক্ষুনি, এই নাও।' বলতে বলতেই তিন থলি ঝকঝকে মোহর এসে কামারের কাছে হাজির হ'লো; কামার সেগুলো সিন্দুকে তুলে শয়তানকে বললো, 'আচ্ছা, তবে যাও।'

শয়তান ছাড়া পেয়েই সেখান থেকে এমনি ছুট্ দিলো যে ছুট্ যাকে বলে।

তখন কামার আর তার স্ত্রী মেঝেয় গড়াগড়ি দিয়ে যে হাসি হাসলো, সে আর কী বলবো! আর সাত বছরের জন্যে তাদের কোনো ভাবনা রইলো না। সাত বছর যখন শেষ হ'লো, তখন কামারের টাকাও ফুরিয়ে গেলো, তাকে আবার তার ব্যবসা ধরতে হ'লো, ততোদিনে শয়তানও আবার তাকে নেবার জন্যে এসে উপস্থিত হ'লো।

সাত বছর পরে শয়তান আবার কামারকে নেবার জন্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু গত বারে সে নাকে যে চিমটি খেয়ে গিয়েছিলো, তার কথা ভেবে আর সে সোজাসুজি কামারের সামনে এসে দাঁড়াতে ভরসা পাচ্ছে না, তাই এবারে সে ভারী এক ফন্দি এঁটে এসেছে।

শয়তান জানে যে, কেউ যদি তাকে নিজে থেকে আদর ক'রে নিয়ে যায়, তাহলে আর সে কিছুতেই তার হাত ছাড়াতে পারে না। তখন শয়তান করলো কি, একটি ঝকঝকে মোহর হয়ে ঠিক কামারের দোকানের সামনে রাস্তায় গিয়ে পড়ে রইলো। সে ভাবলো যে, কামার খেতে পায় না, মোহরটি দেখলে সে পরম আদরে তাকে এসে তুলে নিয়ে যাবে; তারপর আর সে শয়তানকে ফাঁকি দিয়ে যাবে কোথায়?

যে কথা সেই কাজ। কামার সেই মোহরটিকে দেখতে পাওয়া মাত্রই ছুটে গিয়ে সেটিকে তুলে এনে তার থলেয় পুরলো। তখন থলের ভিতর থেকে শয়তান হেসে তাকে বললো, 'কী বাপু, এখন কোথায় যাবে? নিজে ধরে আমাকে ঘরে এনেছো, তার মজাটা এখনই দেখতে পাবে!'

কামার বললো, 'কী রে বেটা, তুই নাকি? তোর বুঝি আর মরবার জায়গা জোটে নি, তাই আমার থলের ভেতরে এসেছিস? দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি!'

এ কথায় শয়তান এমনি বেজায় রেগে গেলো যে, পারলে সে তখনই কামারকে মেরে শেষ করে। কিন্তু থলের বাইরে এলে তবে তো শেষ করবে! সে যে সেই বিষম থলে—তার ভিতরে ঢুকলে আর বেরোবার হুকুম নেই। শয়তান বেচারার খালি ছট্‌ফটানিই সার হ'লো, সে আর থলের ভেতর থেকে বেরুতে পারলো না। ততোক্ষণে কামার সেই থলেটি তার নেহাইয়ের উপর রেখে গিন্নীকে ডেকে, দু'জনে দুই প্রকাণ্ড হাতুড়ি দিয়ে দমাদ্দম দমাদ্দম এমনি পিটুনি জুড়লো যে, পিটুনি যাকে বলে! পিটুনি খেয়ে শয়তান খানিক খুব চেঁচালো। তারপর যখন আর চেঁচানি আসে না, তখন গোঙাতে গোঙাতে বললো, 'ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে

পড়ি! এবার তোমাকে বিশাল বিশাল ছয় থলে ভরা মোহর দেবো, আর—আর কখনো তোমার কাছে আসবো না!'

এ কথায় কামারের গিন্নী বললো, 'ওগো, সে হ'লে নেহাত মন্দ হবে না; দাও হতভাগাকে ছেড়ে!'

তখন কামার বললো, 'কই তোর মোহরের থলে?' বলতে বলতেই এমনি বড়ো বড়ো ছ'টা মোহরের থলে এসে হাজির হ'লো যে, তারা দু'জনে মিলেও তার একটাকে টেনে তুলতে পারে না। তখন কামার একগাল হেসে, তার থলের মুখ খুলে দিয়ে বললো, 'যা বেটা! ফের তোর পোড়া মুখ এখানে দেখাতে আসবি তো টের পাবি মজা।' ততোক্ষণে শয়তান থলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এমনি ব্যস্ত হয়ে ছুট্ দিলো যে, কামারের সবকথা শুনতেও পেলো না।
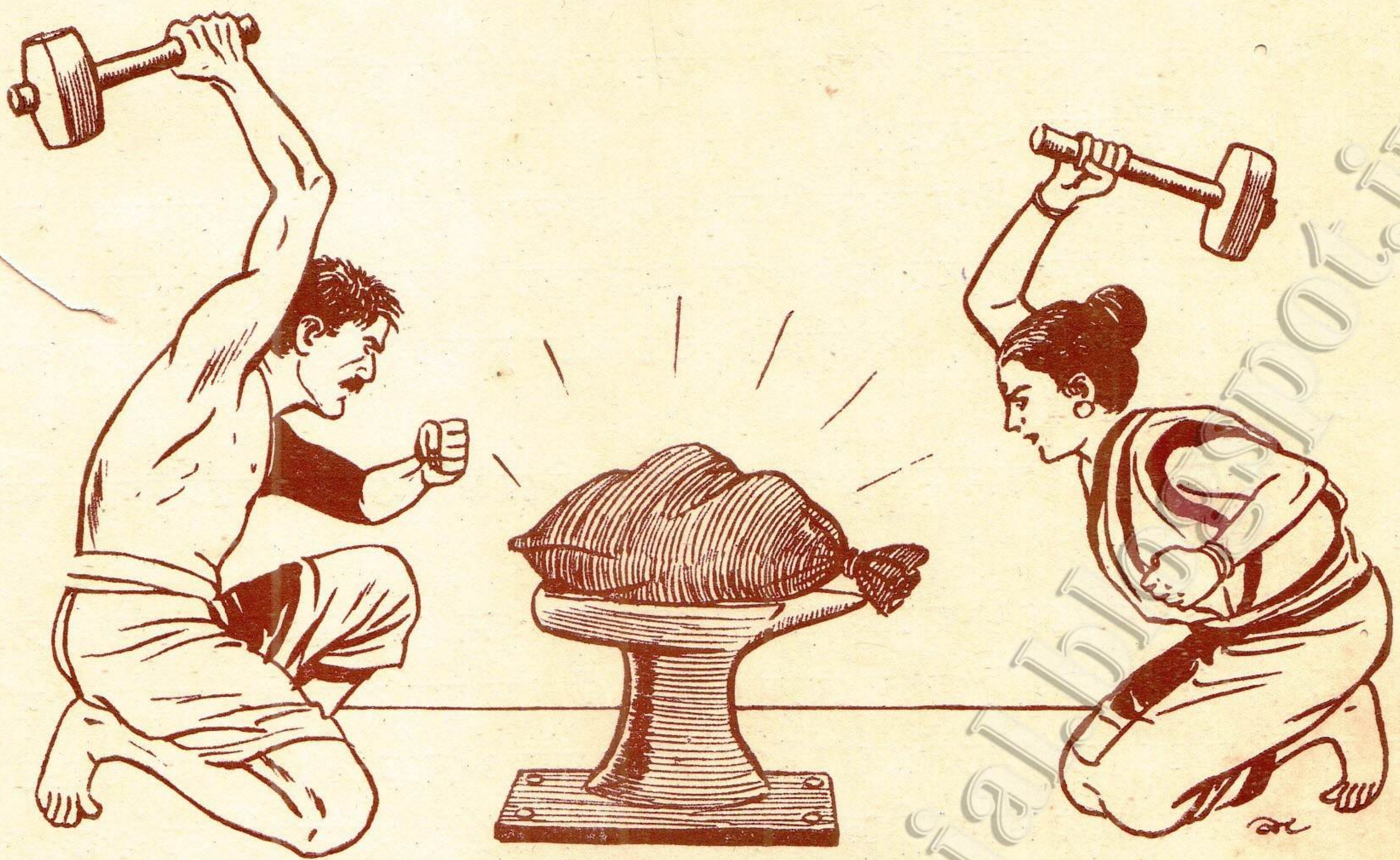
সেই ছ'টা থলের ভেতরে এতো মোহর ছিলো যে, কামার হাজার ধুমধাম করেও তা শেষ করতে পারলো না। চার থলে ভালো ক'রে ফুরুতে না ফুরুতেই সে বুড়ো হয়ে শেষে একদিন মরে গেলো। মরে গিয়ে ভূত হয়ে সে ভাবলো যে, এখন তো হয় স্বর্গে না হয় নরকে দুটোর একটায় যেতে হবে। আগে স্বর্গের দিকে গিয়েই দেখি-না, যদি কোনোমতে সেখানে ঢুকতে পারি।

স্বর্গের ফটকের সামনে গিয়ে তার দেবতাটির সঙ্গে দেখা হ'লো, যিনি তাকে সেই তিনটি বর দিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে কামার ভারী খুশি হয়ে ভাবলো, এই ঠাকুরটি না আমাকে সেই চমৎকার বরগুলো দিয়েছিলেন! ইনি অবশ্যি আমাকে ঢুকতেও দেবেন।

কিন্তু দেবতা তাকে দেখেই যারপরনাই রেগে বললেন, 'এখানে এসেছিস কী করতে? পালা হতভাগা, শীগ্‌গির পালা!'

কাজেই তখন বেচারা কী আর করে! সে সেখান থেকে ফিরে নরকের দিকে চললো। সেখানকার ফটকের সামনে উপস্থিত হ'লে শয়তানের দারোয়ানেরা তাকে জিগ্যেস করলো, 'তোমার নাম?'

কামার তার নাম বলতেই পাঁচ-ছ'টা দারোয়ান ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে শয়তানকে বললো, 'মহারাজ! সেই কামার এসেছে!'

তা শুনে শয়তান বিষম চমকে গিয়ে একটা লাফ যা দিলো কি আর বলবো! তারপর পাগলের মতো ফটকের কাছে ছুটে এসে দারোয়ানদের বললো, 'শীগ্‌গির দরজা বন্ধ কর্! আঁট্ হুড়কো! লাগা তালা! খবরদার! ও বেটাকে ঢুকতে দিবি না! ও এলে আর কি আমাদের রক্ষে থাকবে!'

শয়তানের গলা শুনে কামার গরাদের ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে হাসতে হাসতে বললো, 'কী হে! কী খবর?'

সে কথা শেষ হ'তে না হ'তেই শয়তান এক লাফে এসে এমনি তার নাক মলে দিলো যে, কী বলবো! কামার তখনই সেখান থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে পালালো, কিন্তু তার আগেই তার নাকে আগুন ধরে গিয়েছিলো। সে আগুন আজও নেভে নি। কামার তার জ্বালায় অস্থির হয়ে জলায় জলায় নাক ডুবিয়ে বেড়ায়। লোকে সেই আগুন দেখতে পেলে বলে, 'ঐ আলেয়া।'

এক দানব আর এক চাষা, দুজনে পাশা খেলছিলো। খেলায় চাষার হার হ'লো।

পাশায় হেরে চাষা হায় হায় করতে লাগলো। খেলবার আগে সে বাজি রেখেছিলো যে, সে হারলে দানব তার ছেলেটিকে নিয়ে যাবে। এখন উপায় কী হবে? দানব কিছুতেই

ছাড়ছে না; সে বলছে, 'কালই এসে আমি ছেলে নিয়ে যাবো। যদি তাকে রাখতে চাও, তবে এমন ক'রে তাকে লুকিয়ে রেখে দাও, যাতে আমি তাকে খুঁজে বার করতে না পারি। খুঁজে পেলে কিন্তু আর তাকে ফেলে যাবো না।'

হায়, কী বিপদ! ছেলেটিকে কোথায় লুকোবে? যেখানেই রাখুক, দানব নিশ্চয় তাকে খুঁজে বার করবে। চাষা ভেবে কিছু বুঝতে না পেরে শেষে দেবতার রাজাকে ডাকতে লাগলো। দেবতার রাজা তার দুঃখ দেখে দয়া ক'রে

এসে বললেন, 'তোমার কোনো চিন্তা নেই ; আমি তোমার ছেলেটিকে এমন ক'রে লুকিয়ে রেখে দেবো যে দানবের বাবাও তাকে খুঁজে বার করতে পারবে না।'

এই বলে তিনি ছেলেটিকে গমের ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে তাকে একটি ছোট্ট গমের ভিতরে লুকিয়ে রাখলেন। তার পরদিন দানব এসে চাষার ঘরে, বাগানে, পুকুরে, বাক্সে, উনুনে, হাঁড়িতে, হুঁকোর ভিতরে—কতোই খুঁজলো, কোথাও ছেলেটিকে দেখতে পেলো না। কিন্তু সে এমনি দুষ্ট দানব ছিলো—সে তখনি বুঝে নিলো যে, তবে নিশ্চয় গমের ক্ষেতে গমের ভিতরে লুকিয়ে রেখেছে। অমনি সে কাস্তে নিয়ে গিয়ে ঘ্যাঁশ ঘ্যাঁশ ক'রে গম কাটতে লাগলো। সব গম কেটে, তারপর তার এক-একটি ক'রে দানা হাতে নিয়ে উল্‌টেপাল্‌টে দেখে, সে দু'দণ্ডের মধ্যেই ধ'রে ফেললো যে, এই গমটার ভিতরে চাষার ছেলে বসে আছে।

আর একটু হলেই সে সেই গমটার ভিতর থেকে চাষার ছেলেটিকে বার ক'রে নিয়ে যেতো। এর মধ্যে দেবতার রাজা এসে তার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি চাষার হাতে দিয়ে বললেন, 'আমার যা সাধ্য আমি তা করেছি ; এর বেশী আর পারবো না।'

দানব ছেলেটিকে নিতে না পেরে ভারী চটে গিয়ে বললো, 'বটে, আমাকে ফাঁকি দিলে ! সে হবে না ; আমি কাল আবার আসবো।'

দেবতার রাজা যখন পারলেন না, তখন চাষা আলোর দেবতার কাছে গেলো। আলোর দেবতা এসে তার ছেলেটিকে একটা রাজহাঁসের গলায় পালক বানিয়ে রেখে দিলেন। কিন্তু তাতে কি সে দানবকে ঠকাবার জো আছে ? সে এসেই হাঁসের গলা ছিঁড়ে সেই পালকটি-সুদ্ধ তাকে মুখে দিতে তুলে নিয়েছে। ভাগ্যিস পালকটি তখন তার ঠোঁটে লেগে রইলো, নইলে আর উপায়ই ছিলো না। পালকটিকে দানবের ঠোঁটে লাগতে দেখেই আলোর দেবতা সেটিকে উড়িয়ে নিয়ে চাষার কাছে পৌঁছে দিলেন, আর বললেন, 'আমি আর কিছু করতে পারবো না।'

দানব সেদিনও ঠকে গেলো ; কিন্তু যাবার সময় ব'লে গেলো, 'কাল আবার আসবো।'

দেবতার রাজা হেরে গেলেন, আলোর দেবতা হেরে গেলেন। চাষা তখন আগুনের দেবতাকে ডেকে বললো, 'ঠাকুর ! আপনি আমার ছেলেটিকে বাঁচান !' আগুনের দেবতা তখন ছেলেটিকে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে একটা মাছের পেটের মধ্যে তার একটি ডিমের ভিতরে লুকিয়ে রাখলেন।

দানব কিন্তু সবই টের পেয়েছে, আর তাই এবারে সে ছিপ নিয়ে তৈরী হয়েই এসেছে। সমুদ্রে কতো কোটি কোটি মাছ, তার ভিতর থেকে সে সেই মাছটাকে দেখতে দেখতে ধরে ফেললো। সেই মাছটার পেটে কতো কোটি কোটি ডিম, তার ভিতর থেকে সে সেই ডিমটাকে দেখতে দেখতে খুঁজে বার করলো।

তখন আগুনের দেবতা সেই ডিমটি তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চুপি চুপি ছেলেটিকে বললেন, 'শিগগির ঘরে পালিয়ে যা; ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ ক'রে দিস।' এ কথা তখন দানব শুনতে পায় নি। তার পর ছেলেটি পালিয়ে

অনেক দূরে গেলে সে তাকে দেখতে পেলো। অমনি ঘোঁত্ করে লাফিয়ে উঠে সে তার পিছু পিছু ছুটলো। কিন্তু ছেলেটি ততক্ষণে ঘরে ঢুকে গিয়েছে। দানবটাও তাকে ধরবার জন্য তাড়াতাড়ি গেল সেই ঘরে ঢুকতে ; সে জানতো না যে আগুনের দেবতা এর আগেই কখন সেই ঘরের দরজায় তিন হাত লম্বা এক লোহার খোঁচ বসিয়ে রেখেছেন। দানব রাগে ভূত হয়ে ঘরে ঢুকবার সময় সেই

খোঁচ আগাগোড়া গেলো তার মাথায় ঢুকে। তখন সে ভয়ানক চেঁচিয়ে চিত্‌পাত হয়ে পড়ে যেতেই আগুনের দেবতা ছুটে এসে তার একটা পা কেটে ফেললেন।

কিন্তু পা কাটলে কী হবে? দুষ্ট দানব তাতে কী জাদুই করে রেখেছে,—সেই কাটা পা তখনি এসে আবার জোড়া লেগে গেলো! যা হোক, আগুনের দেবতা সেই দানবের থেকেও বড় জাদুকর ছিলেন; তিনি জানতেন যে কাটা জায়গায় লোহা আর পাথর ফেলে দিলে আর তা জোড়া লাগতে পারে না। কাজেই তিনি তাড়াতাড়ি দানবের আর-একটা পা কেটেই লোহা আর পাথর দিয়ে কাটা জায়গা
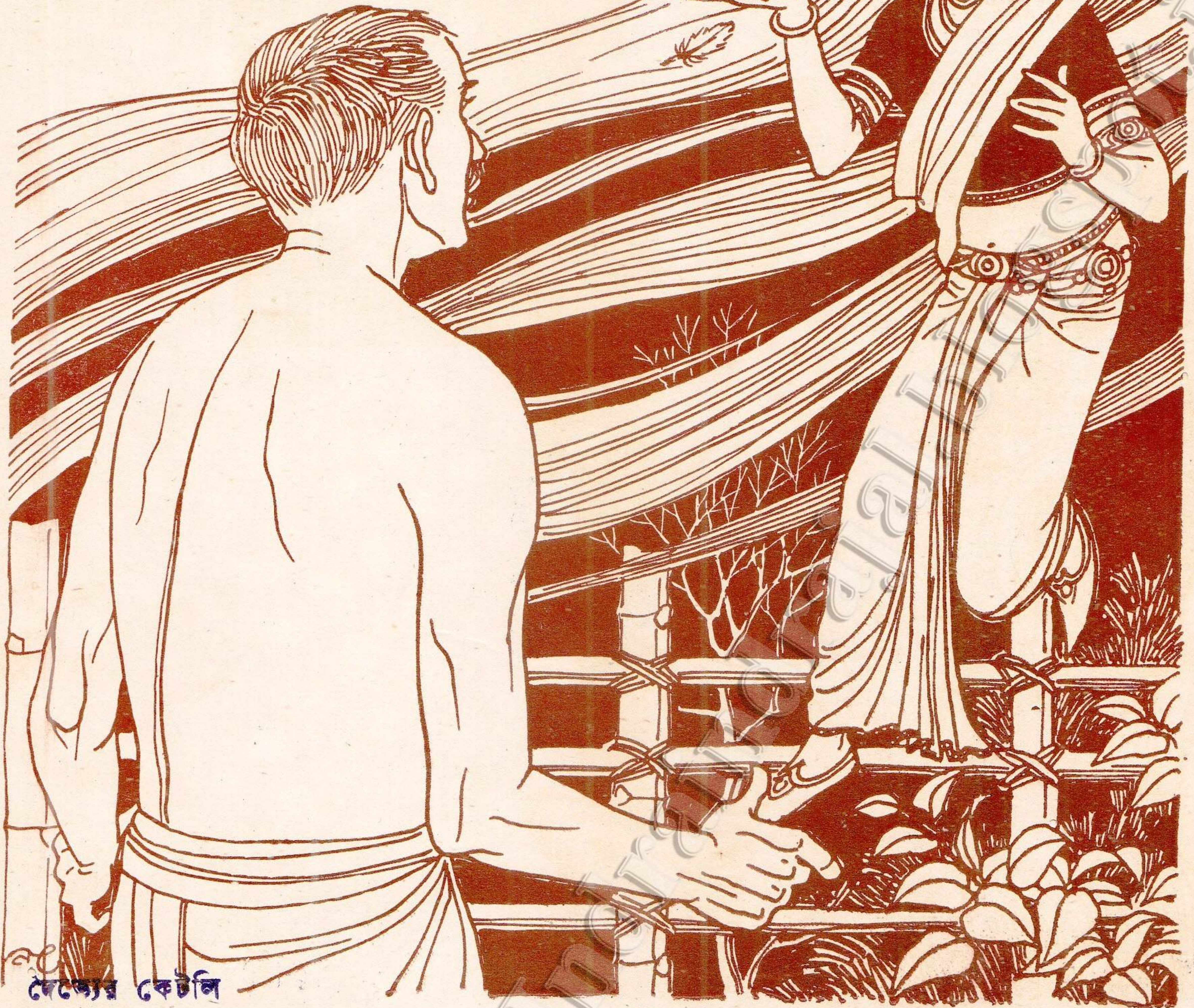
চাপা দিয়ে ফেললেন। তখন আর দানবের জাদু খাটলো না, দেখতে দেখতে তার প্রাণ বেরিয়ে গেলো।

তখন তো চাষার খুবই আনন্দ হ'লো। সে আগুনের দেবতাকে কতো প্রণাম যে করলো তা গুণে শেষ করা যায় না। তারপর থেকে সে সকলকে বলতো যে, এই দেবতাটির মতো দেবতা আর নেই।

ঝানু চোর চানু
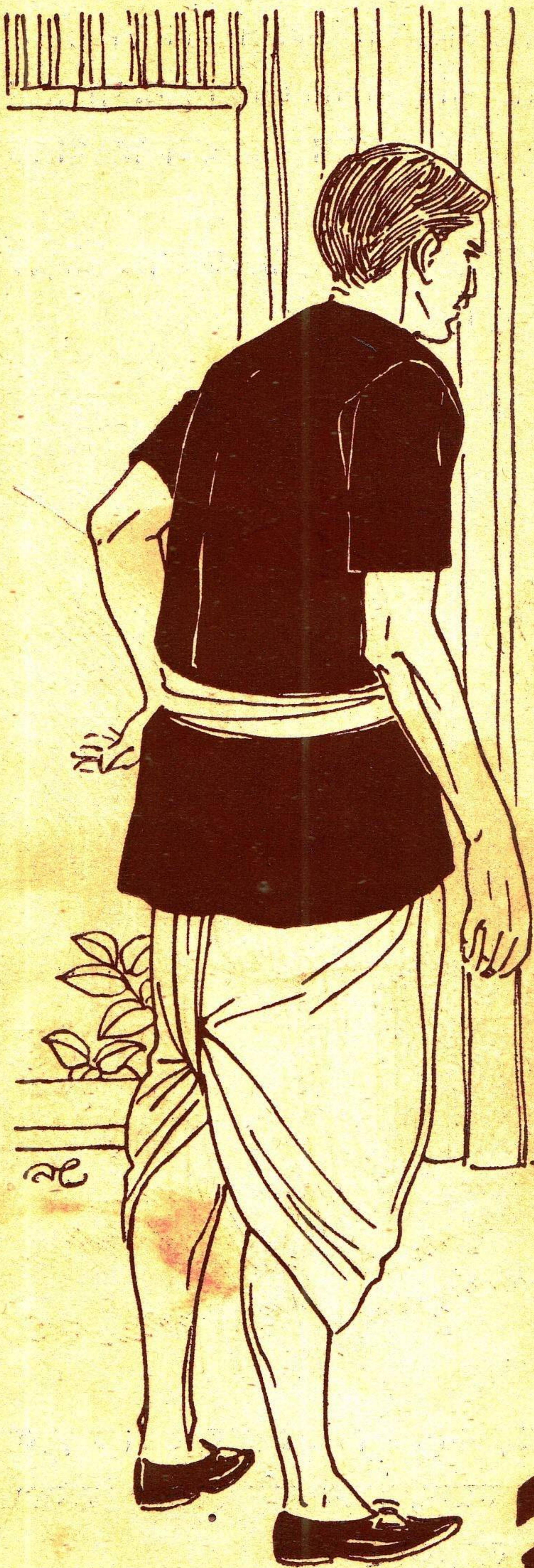
ছেলেবেলা থেকেই চানু শয়তানের একশেষ। আশ-পাশের লোকজন তার জ্বালায় অস্থির। চানুর বাবা বড়ো গরিব, তাই চানু ভাবলো—বিদেশে গিয়ে সে টাকাপয়সা রোজগার ক'রে আনবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। একদিন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। খানিক দূর গিয়েই দেখে বনের ভিতর দিয়ে একটা নির্জন রাস্তা—চানু সেই রাস্তা ধরে চললো। সমস্ত দিন বৃষ্টিতে ভিজে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যার সময় পথের ধারেই একটি কুঁড়েঘর ছিলো, সেখানে এসে উপস্থিত হ'লো।

ঘরের ভিতরে আগুনের পাশে একটি বুড়ি বসে ছিলো, চানুকে দেখে সে জিগ্যেস করলো, 'কী চাই বাপু তোমার?'

চানু বললো, 'চাইবো আর কী, কিছু খাবার-দাবার চাই, আর একটি বিছানা চাই।'

বুড়ি বললো, 'সরে পড়ো বাপু! এখানে কিছু পাবে না। আমার ছয়টি ছেলে, সারাদিন খেটে-খুটে তারা এখনি বাড়ি ফিরবে। তোমাকে এখানে দেখতে পেলে তারা তোমার গায়ের চামড়া তুলে ফেলবে।'

চানু বললো, 'সেটা আর বেশি কথা কী? এই ঠাণ্ডায় বাইরে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে মরার চেয়ে গায়ের চামড়া তুলে ফেললে সেটাই বরং ভালো।'
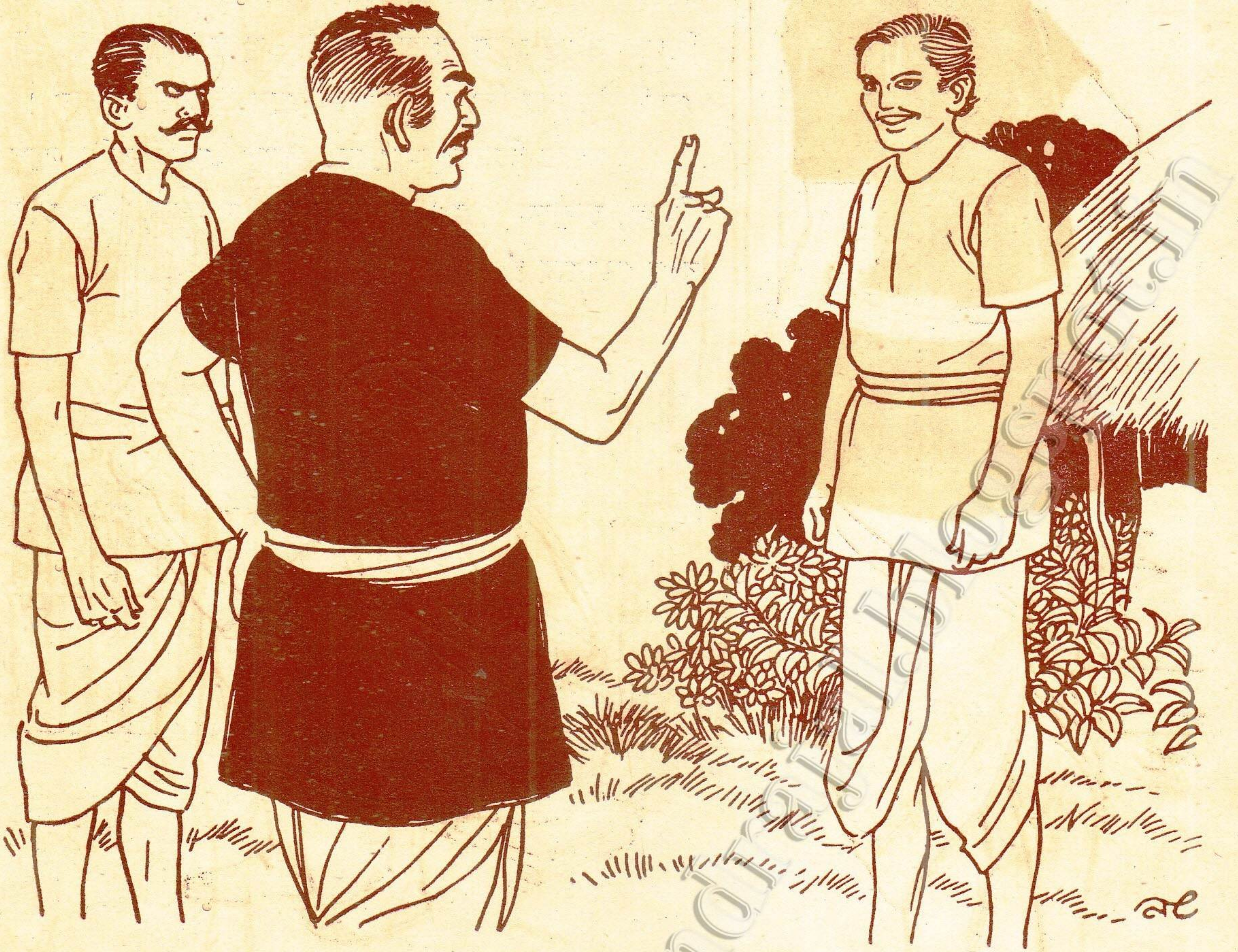
বুড়ি দেখলো, সে সহজ লোকের পাল্লায় পড়ে নি; কী আর করে, তখন চানুকে পেটভরে খেতে দিলো। শুতে যাবার সময় চানু বুড়িকে বললো, 'দেখো বুড়ি, তোমার ছেলেরা এসে যদি আমার ঘুম ভাঙায় তা হলে কিন্তু বড্ড মুশকিল হবে, বলছি।'

পরের দিন ঘুম ভাঙলে পরে চানু দেখলো ছয় জন অতি বদ-চেহারার লোক তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে—সে তাদের দেখে গ্রাহ্যও করলো না।

দলের সর্দারটি তখন চানুকে জিগ্যেস করলো, 'তুমি কে হে বাপু? কী চাও এখানে?'

চানু বললো, 'আমার নাম সর্দার চোর, আমার দলের জন্য লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমরা যদি চালাক-চতুর হও তাহলে তোমাদের অনেক বিদ্যে শিখিয়ে দেবো।'

সর্দার বললো, 'আচ্ছা বেশ, তুমি তা হলে এখন উঠে একটু খাও-দাও, তারপর দেখা যাবে'খন কে সর্দার।'

বিছানা থেকে উঠে সকলের সঙ্গে বসে চানু খেলো। ঠিক তার পরেই দেখলো একটা সুন্দর ছাগল সঙ্গে নিয়ে একজন কৃষক বনের পাশে
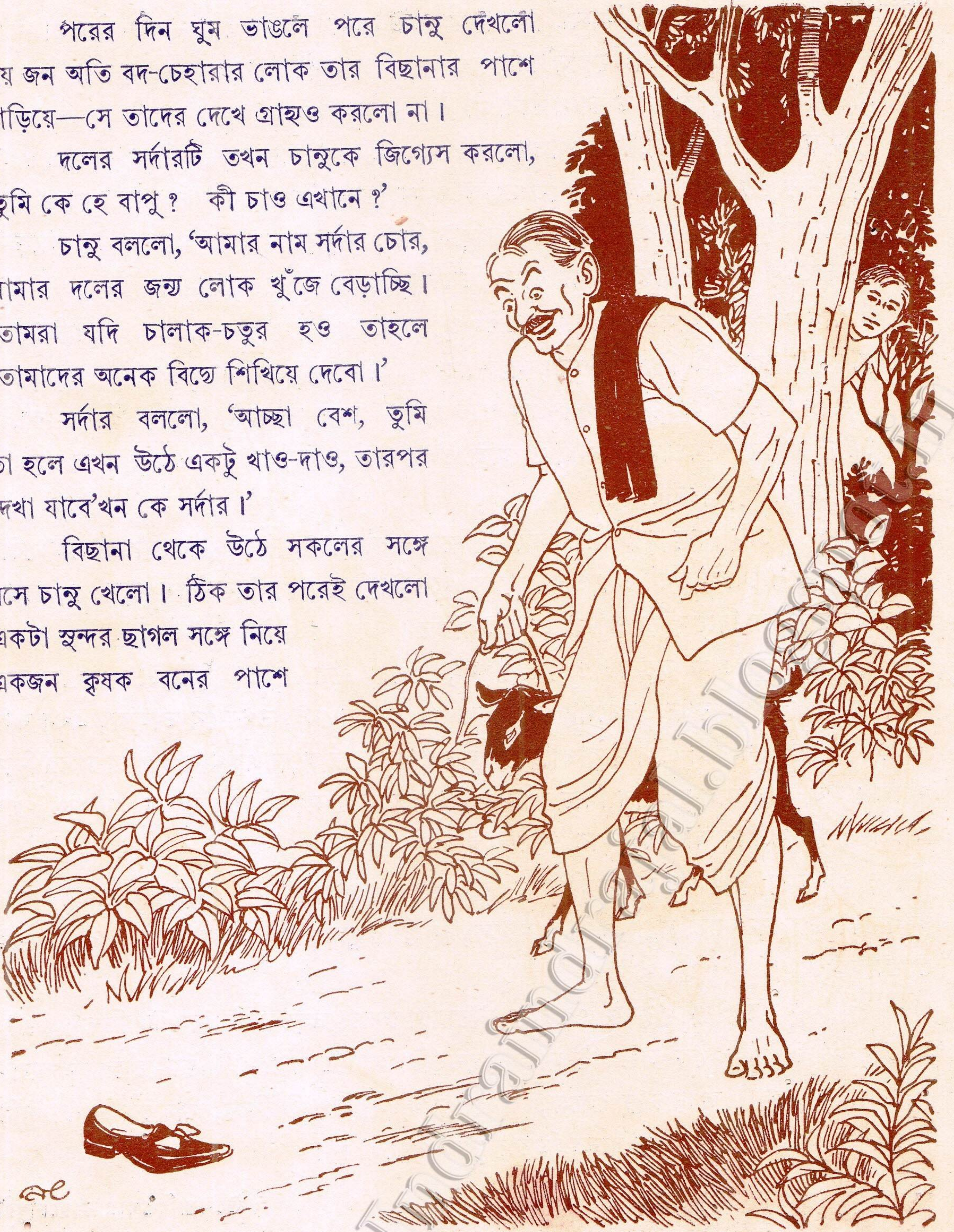
যাচ্ছে। তখন চানু বললো, 'আচ্ছা, তোমাদের কেউ কোনো-রকম জোর-জবরদস্তি না করে শুধু ফাঁকি দিয়ে ঐ লোকটার ছাগলটা নিয়ে আসতে পারো?' একজন একজন করে সকলেই বললো, 'না ভাই, আমরা কেউ তা পারবো না।'

চানু বললো, 'বাস, তা হলেই দেখো আমি তোমাদের সর্দার কিনা—আমি এখনি ছাগলটা নিয়ে আসছি।' এই বলে সে তখনই বনের ভিতর দিয়ে গিয়ে রাস্তার মোড়ে তার ডান পায়ের জুতোটা রেখে দিলো, তারপর ছুটে গিয়ে কিছু দূরে রাস্তার আর-একটা মোড়ে বাঁ পায়ের জুতোটাও রেখে রাস্তার ধারে বনের ভিতর চুপ করে লুকিয়ে রইলো।

খানিক পরেই সেই কৃষক এসে প্রথম জুতোটা দেখে মনে করলো, 'খাসা জুতোটা পড়ে রয়েছে, কিন্তু এক পাটি দিয়ে কী হবে, আর-এক পাটিও থাকলে ভালো হ'তো।'

খানিক দূর এগিয়ে কৃষক আর-এক পাটি জুতো দেখে ভাবলো, 'আমি কী বোকা, ও পাটিটা যদি নিয়ে আসতাম! যাই, তা হলে ওটা নিয়ে আসি গিয়ে।' একটা গাছে ছাগলটা বেঁধে সে চললো জুতো আনতে।

এদিকে চানু কিন্তু ছুটে গিয়ে আগেই নিয়ে এসেছে। তারপর কৃষক ছাগলটাকে বেঁধে রেখে যখন চলে গেলো তখন চানুও বাঁ পায়ের জুতোটা নিয়ে ছাগলটার বাঁধন খুলে সেটাকেও নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে বুড়ির কুটিরে এসে উপস্থিত।

কৃষক গিয়ে প্রথম জুতোটাও পেলো না, ফিরে এসে পরের জুতোটাও পেলো না, তার উপর আবার যখন দেখলো যে ছাগলটিও সেখানে নেই, তখন সে ভাবলো, এখন করি কী? গিন্নিকে যে বলে এসেছি বাজারে ছাগলটা বেচে তার জন্যে একখানা গায়ের চাদর নিয়ে যাবো! যাই তা হলে চুপচাপ গিয়ে আর-একটা জন্তু নিয়ে আসি, তা নইলে যে ধরা পড়ে যাবো—গিন্নি ভাববে আমি বোকার একশেষ।

এদিকে চানু ছাগল নিয়ে বুড়ির বাড়িতে যখন গেলো তখন সেই চোরেরা তো একেবারে অবাক! চানুকে কতো করে জিগ্যেস করলো, কিন্তু কিছুতেই সে বললো না কী করে সেই ছাগল আনলো।

খানিক বাদেই সেই কৃষক একটা মোটাসোটা সুন্দর ভেড়া নিয়ে এসে উপস্থিত। চানু বললো, 'যাও দেখি, কে জবরদস্তি না করে ভেড়াটা আনতে পারো।' ছয় চোরের সকলেই অস্বীকার করলো। তখন চানু বললো, 'আচ্ছা দেখি, আমি পারি কিনা, আমাকে একটা দড়ি দাও দেখি।' দড়ি নিয়ে চানু বনের ভিতরে ঢুকে পড়লো।
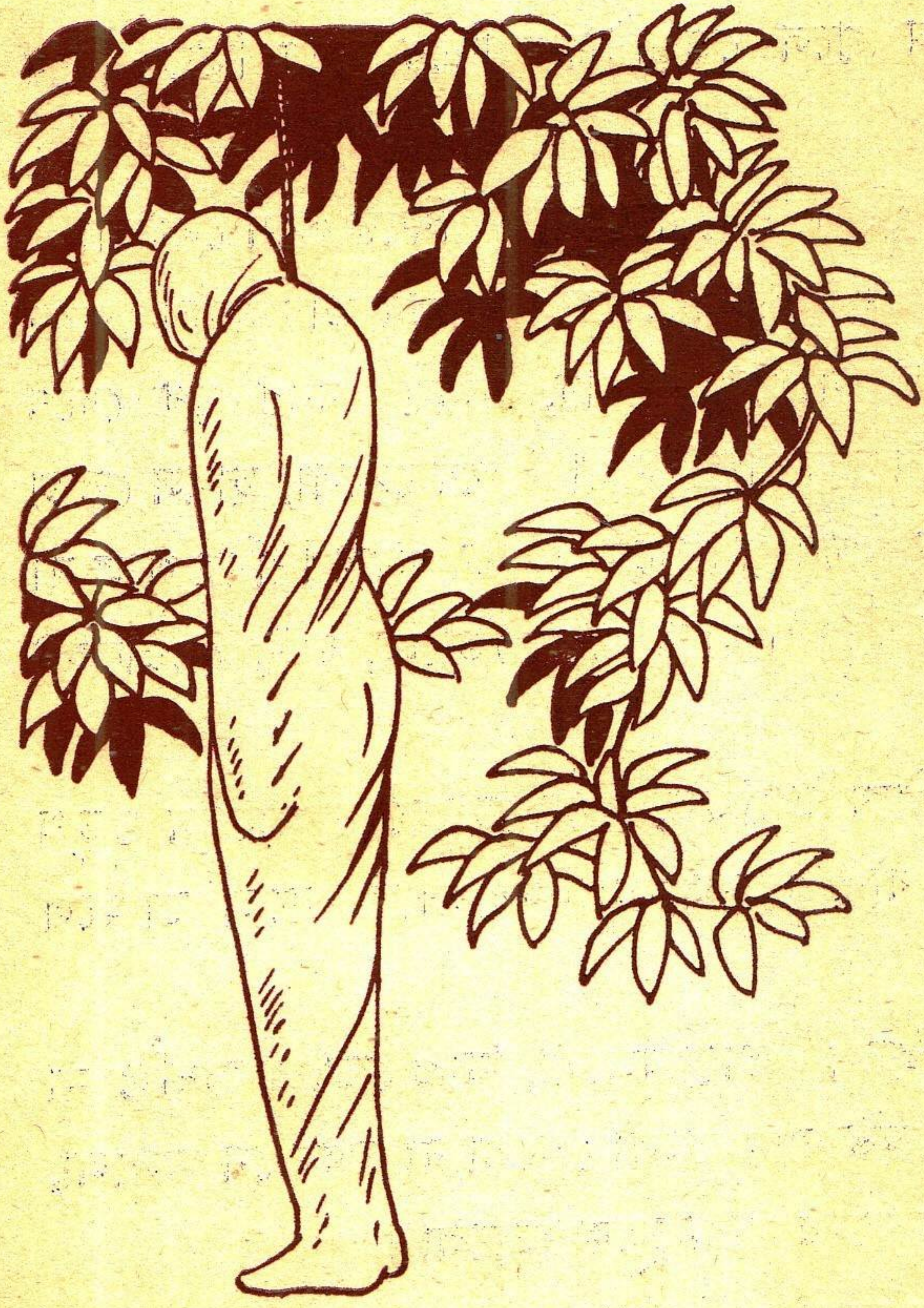
এদিকে কৃষকটি তার ছাগল চুরির কথা ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে চলেছে। মোড়ের কাছেই এসে দেখে গাছের ডালে একটা মড়া ঝুলছে। মড়া দেখেই তার গায়ে কাঁটা দিলো, 'রক্ষা করো বাবা! খানিক আগে তো এখানে মড়া-টড়া কিছু দেখতে পাই নি!' সামনের মোড়ে গিয়ে কৃষক দেখলো আরেকটা মড়া গাছের ডালে ঝুলছে। 'রাম রাম রাম—এ হ'লো কী? আমার মাথাটা গুলিয়ে যায় নি তো?' কৃষক তাড়াতাড়ি চললো। কিন্তু কী সর্বনাশ! রাস্তার আরেকটা মোড়ে গিয়ে দেখে সেখানেও একটা মড়া ঝুলছে। পর পর তিন-তিনটে মড়া এতোটা কাছাকাছি ঝুলছে দেখে তার মনে সন্দেহ হ'লো—'নাঃ, এ কখনোই হতে পারে না, আমারই বোধ করি মাথা খারাপ হয়েছে। আচ্ছা, দেখে আসি আগের মড়া দুটো এখনও গাছে ঝুলছে কিনা।'

কৃষক সবে মাত্র মোড়টা ফিরেছে
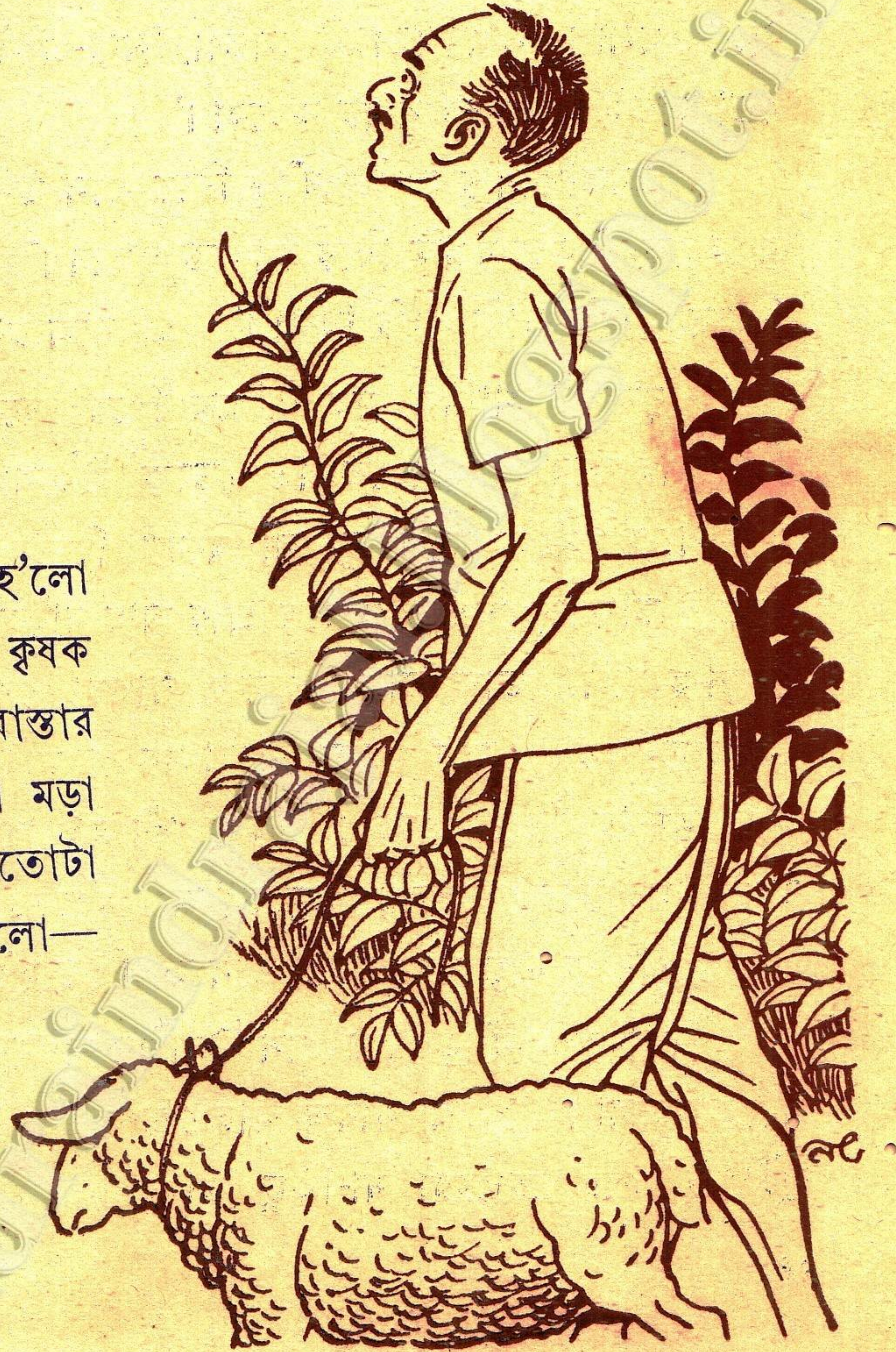
তখন ডালের মড়া চট্ করে নেমে এসে বাঁধন খুলে ভেড়াটাকে নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে একেবারে বুড়ির বাড়ি গিয়ে হাজির।

এদিকে কৃষক গিয়ে দেখলো মড়া-টড়া কিছুই গাছে ঝুলছে না। ফিরে এসে দেখলো—তার ভেড়াটাও নেই, কে জানি দড়ি খুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। তখন তার মনটা কেমন হ'লো তা বুঝতেই পারো! বেচারি মাথা খুঁড়তে লাগলো—'হায়, হায়! কার মুখ দেখে আজ বেরিয়েছিলাম, এখন গিন্নি কী বলবে? সমস্ত সকালটাই মাটি হয়ে গেলো, ছাগল ভেড়া দুটোই গেলো; এখন করি কী? একটা কিছু এনে বাজারে বিক্রি করে গিন্নির শাল না কিনলেই চলবে না। আসবার সময় দেখেছিলাম ষাঁড়টা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে, যাই, সেটাকেই গিয়ে নিয়ে আসি—গিন্নিও দেখতে পাবে না।'

চানু যখন চোরদের বাড়ি ভেড়া নিয়ে গিয়ে উপস্থিত, তখন চোরেদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেলো। সর্দার চোরটি বললো, 'আর-একটা যদি এরকম চালাকি খেলতে পারো তা হলে তোমাকেই আমাদের সর্দার করবো।'

ততোক্ষণে কৃষকটিও ষাঁড় নিয়ে এসে উপস্থিত। চানু বললো, 'যাও তো, জবরদস্তি না করে কে ষাঁড়টা ফাঁকি দিয়ে আনতে পারো।' কেউ যখন ভরসা পেলো না তখন সে বললো, 'আচ্ছা, দেখি আমি পারি কিনা।' এই বলে চানু বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

কৃষকটি খানিক দূর এগিয়ে গিয়েই বনের মধ্যে একটা ছাগলের ডাক শুনতে পেলো। ঠিক তার পরেই একটা ভেড়াও ডেকে উঠলো। আর তাকে রাখে কে! একটা গাছে ষাঁড়টাকে বেঁধে রেখে ছুটলো বনের ভিতর। কৃষক যতো যায় ততোই শোনে, এই একটু আগেই ডাকছে, দেখতে দেখতে প্রায় আধ মাইল দূরে চলে গেলো। তখন হঠাৎ সব চুপচাপ, ভেড়া-ছাগলের ডাক আর শুনতে পাওয়া গেলো না। এদিক-সেদিক খুঁজে খুঁজে কৃষক একেবারে হয়রান হয়ে গেলো—কোথায় বা ছাগল আর কোথায় বা ভেড়া। বেচারি কাহিল হয়ে আবার ফিরে এলো। কিন্তু কী সর্বনাশ! এসে দেখে ষাঁড়টিও সেখানে নেই। বন উলটপালট করে ফেললো, কিছুতেই আর ষাঁড়ের খোঁজ পেলো না।

এদিকে চানু ষাঁড় নিয়ে এসে উপস্থিত হ'লো বুড়ির বাড়ি।

চানু যখন ষাঁড় নিয়ে এসে উপস্থিত তখন আর কথাটি নেই। চোরেরা চানুকেই তাদের সর্দার করলো। তাদের আনন্দ আর দেখে কে! সমস্তটা দিন আমোদ করেই কাটিয়ে দিলো। লুটপাট করে চোরেরা যা-কিছু আনতো একটা গহ্বরের মধ্যে সব লুকিয়ে রাখতো, রাত্রে

খাওয়া-দাওয়ার পর তারা চানুকে নিয়ে সেই সমস্ত টাকাকড়ি দেখালো। চানুই যে এখন তাদের সর্দার, তাকে সব না দেখালে চলবে কেন ?

দলের সর্দার হবার প্রায় এক সপ্তাহ পরে চোরেরা একদিন চানুকে বাড়ির জিম্মায় রেখে চুরি করতে গেলো। খালি বাড়ি, চানু সেই শয়তান বুড়িকে জিগ্যেস করলো, 'আচ্ছা, তুমি যে এদের ঘর-সংসার দেখো, এরা তোমাকে তার দরুন কিছু বকশিশ-টকশিশ দেয় না ?'

বুড়ি বললো, 'বকশিশ দেয়, না ওদের মাথা দেয় !'

চানু চললো, 'বটে, কিচ্ছু দেয় না ! আচ্ছা, এসো আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে ঢের টাকা দেবো।' বুড়িকে সঙ্গে করে চানু টাকার ঘরে গেলো। জন্মেও বুড়ি এতো ধন কোনোদিন দেখে নি—মুখ হাঁ করে সেই রাশি রাশি টাকা আর মোহরের দিকে বুড়ি খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো। তারপর বুড়ির আহ্লাদ আর ধরে না। হাঁটু গেড়ে মাটিতে পড়ে দুই হাতে টাকাগুলো ঘাঁটতে লাগলো। সময় বুঝে চানুও তার পকেট বোঝাই তো করলোই, তারপর একটা থলে মোহর দিয়ে ভর্তি করে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের দিক থেকে দরজায় চাবি লাগিয়ে দিলো—বুড়ি সেই টাকার ঘরেই আটকা পড়ে রইলো।

বেরিয়ে এসেই চানু সুন্দর একটা পোশাক পরলো, তারপর সেই ছাগল, ভেড়া আর ষাঁড়টাকে নিয়ে একেবারে সেই কৃষকের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। কৃষক তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ির দরজায় বসে ছিলো। তারা তো সেই হারানো জন্তুগুলিকে দেখে আহ্লাদে লাফিয়ে উঠলো।

চানু বললো, 'এ জন্তুগুলো কার বলতে পারো কি ?'

'এগুলো যে আমাদের, আপনি কোথায় পেলেন মশায় ?'

'এই বনের ভিতর চরে বেড়াচ্ছিলো। আচ্ছা, ছাগলটার গলায় একটা থলে ঝুলছে, তাতে দশটা মোহর রয়েছে—ওগুলিও কি তোমাদের ?'

'না মশায়, আমরা গরিব দুঃখী লোক, মোহর কোথা পাবো ?

'আচ্ছা, মোহরগুলোও তোমরা নাও, আমার কিছু দরকার নেই।' মোহরগুলি নিয়ে দুই হাত তুলে কৃষক চানুকে আশীর্বাদ করলো।

সমস্ত দিন চলে চানু প্রায় সন্ধ্যার সময় তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখলো তার মা-বাবা বসে আছেন।

চানু বললো, 'ভগবান আপনাদের ভালো করুন, আজ রাতটা আপনাদের বাড়ি থাকতে পারি কি ?'

'আপনার মতো ভদ্রলোক কি এখানে থাকতে পারবেন ? আমরা যে বড্ড গরিব।'

চানু আর চুপ করে থাকতে পারলো না, 'বাবা, তুমি কি তোমার ছেলেকেও চিনতে পারছো না ?'

মা-বাবা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলো, তারপর চানুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'এমন সুন্দর পোশাক তুমি কোথা পেলে বাবা ?'

চানু বললো, 'পোশাক দেখেই অবাক হয়ে গেলে, তাহলে এই টাকাগুলো দেখে কী করবে ?' এই বলে চানু পকেট খালি করে সব মোহর টেবিলের উপর রাখলো।
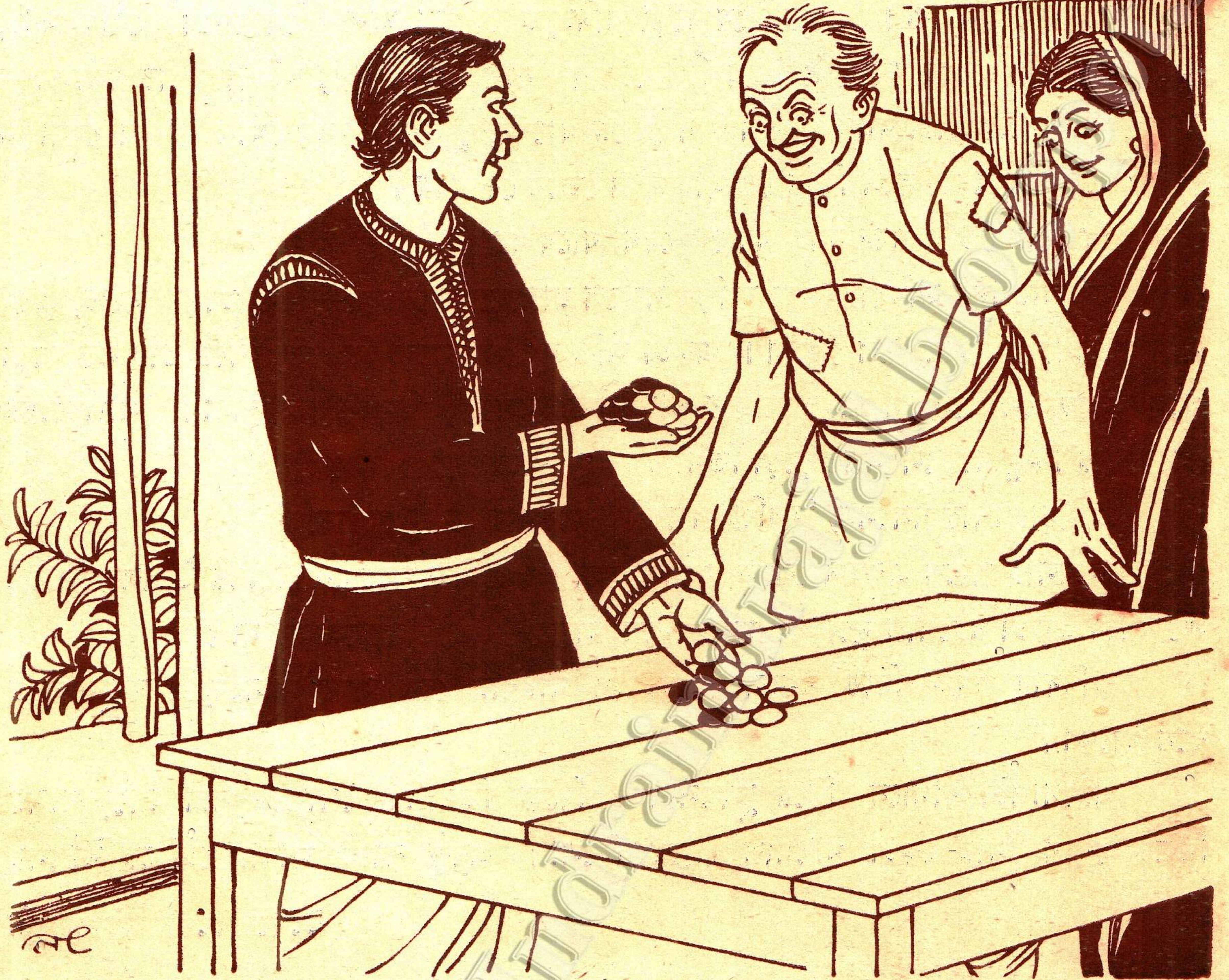
এতোগুলো মোহর দেখে চানুর বাবার বড্ড ভয় হলো। চানু তখন সব কথা খুলে বললো। তার আশ্চর্য বুদ্ধির কথা শুনে চানুর মা-বাপের আনন্দ আর ধরে না।

পরের দিন সকালে চানু বাবাকে বললো, 'বাবা, যাও জমিদারবাড়ি। বলো গিয়ে আমি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।'

চানুর কথা শুনে তার বাবার চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেলো, 'বলিস কী রে বেটা! তা হলে যে আমার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেবে!'

'না। তুমি বলো যে আমি সর্দার চোর, আমার মতো ঝানু চোর দুনিয়ায় নেই, জবরদস্ত ওস্তাদ চোরদের ফাঁকি দিয়ে লাখ টাকা রোজগার করে এনেছি। দেখো বাবা, যখন দেখবে জমিদারের মেয়েও সেখানে আছে তখনই এসব কথা ব'লো।'

'আচ্ছা, এতো করে যখন বলছো, যাচ্ছি, কিন্তু কিছু হবে বলে মনে হয় না।'

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে চানুর বাবা ফিরে এলো। চানু বললো, 'কী করে এলে বাবা?'

'নেহাত মন্দ নয়। মেয়েটি যে বড়ো অনিচ্ছুক তা তো মনে হ'লো না। বোধ করি, তুমি এর আগেও তার কাছে এ প্রস্তাবটি করেছো—না? যা হোক, জমিদারমশায় বললেন—'আসছে-রবিবারে তাঁরা নাকি একটা হাঁস ভেজে খাবেন, তুমি যদি কড়া থেকে হাঁসটা বেমালুম চুরি করতে পারো তা হলে তিনি তোমার কথা ভেবে দেখবেন।'

'এ আর তেমন শক্ত কাজ কী? দেখা যাবে'খন।'

রবিবার দিন জমিদার এবং বাড়ির সকলে রান্নাঘরে রয়েছেন—হাঁস ভাজা হচ্ছে, এমন সময় রান্নাঘরের দরজা খুলে গেলো। একটা অতি কুৎসিত বুড়ো ভিখারি, পিঠে তার মস্ত বড়ো থলে ঝুলছে, সে এসে রন্নাঘরের দরজায় উঁকি মেরে বললো, 'জয় হোক বাবা! আপনাদের খেয়েদেয়ে কিছু থাকলে আমি বুড়ো ভিখারি কিছু খেতে পাবো কি?'

জমিদারমশায় বললেন, 'অবশ্যি পাবে। দাওয়ায় একটু বোসো।'

জানলার পাশে একজন লোক বসে ছিলো। খানিক পরে সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আরে, মস্ত বড়ো একটা খরগোশ ছুটে বাগানের দিকে যাচ্ছে—এটাও মারলে হয় না?'

জমিদার ধমক দিয়ে বললেন, 'খরগোশ মারবার ঢের সময় মিলবে, এখন চুপ করে বসে থাকো।'

খরগোশটা বাগানে গিয়ে ঢুকলো। এদিকে ভিখারির পোশাক-পরা চানু থলের ভিতর থেকে আর-একটা খরগোশ ছেড়ে দিলো। একটু পরেই আবার চেঁচিয়ে উঠলো,

'বাবু, বাবু, খরগোশটা এখনও রয়েছে—এখনও চেষ্টা করলে মারা যায়।'

আবার জমিদার ধমক দিলেন, 'চুপ করে থাকো বলছি!'

খানিক বাদে চানু আরও একটা খরগোশ থলে থেকে বের করে ছেড়ে দিলো। চাকরও অমনি চেঁচিয়ে উঠলো—আর যায় কোথা! একজন একজন করে সব ক'টি চাকর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে খরগোশের পেছনে তাড়া করলো, জমিদারমশায়ও বাদ পড়লেন না।

খরগোশ তাড়িয়ে সকলে ফিরে এসে দেখে ভিখারিও নেই, কড়ার মধ্যে হাঁসও নেই।

জমিদারমশাই বললেন, 'আচ্ছা ফাঁকিটা দিয়েছে চানু, সতি সত্যিই আমাকে জব্দ করেছে।'
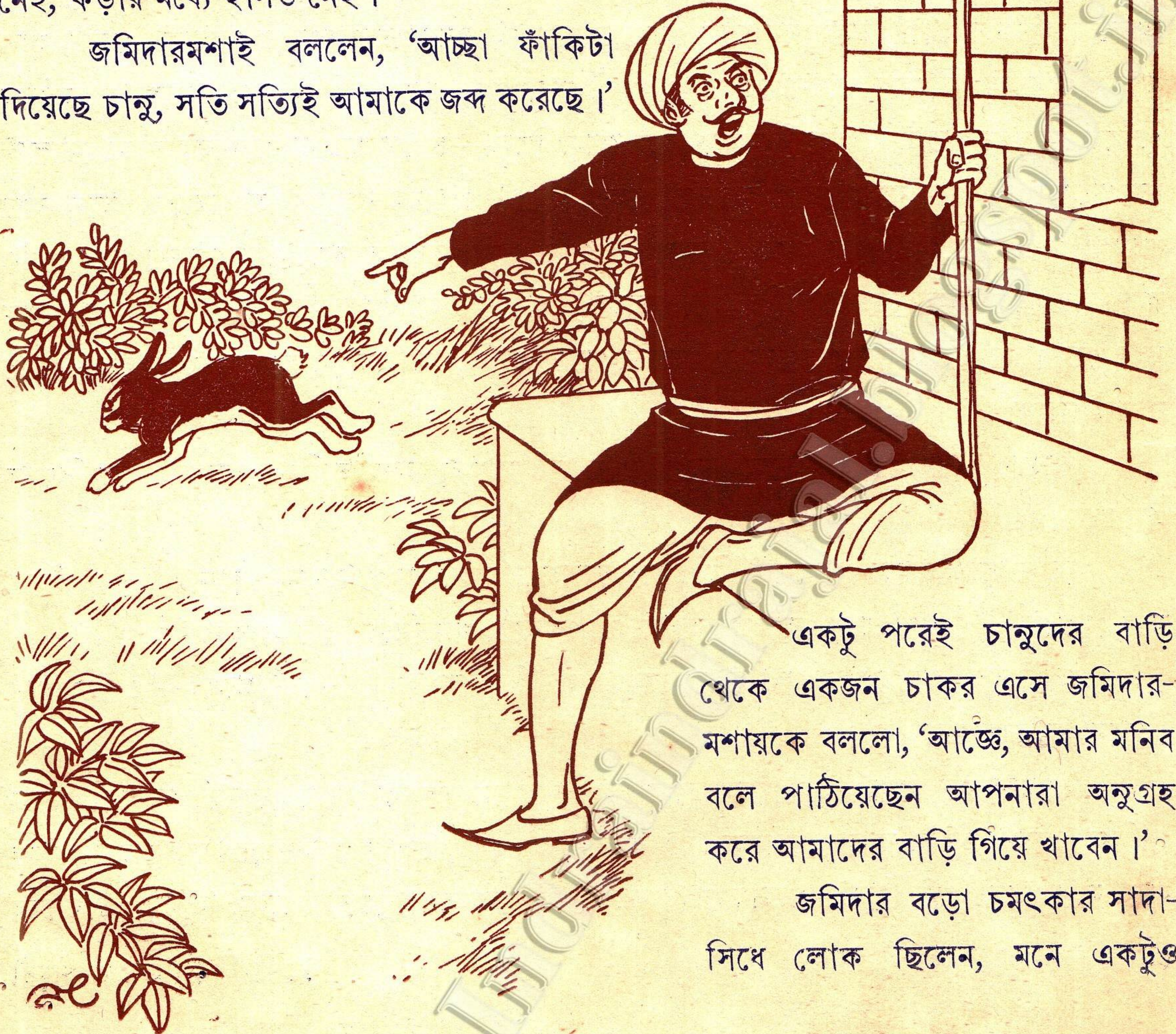
একটু পরেই চানুদের বাড়ি থেকে একজন চাকর এসে জমিদার-মশায়কে বললো, 'আজ্ঞে, আমার মনিব বলে পাঠিয়েছেন আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়ি গিয়ে খাবেন।'

জমিদার বড়ো চমৎকার সাদা-সিধে লোক ছিলেন, মনে একটুও

অহঙ্কার ছিলো না। স্ত্রীকে ও মেয়েকে নিয়ে চানুদের বাড়ি গেলেন এবং সকলের সঙ্গে বসে নানা রকমের ভালো খাবার জিনিসের সঙ্গে তাঁর সেই হাঁস ভাজাটিও খেলেন। চানুর চালাকির কথা বলে জমিদারমশায় হাসতে হাসতে পাঁজরে ব্যথা ধরিয়ে ফেললেন। মেয়েটি তো আগে থেকেই চানুকে পছন্দ করতো, এখন তার পোশাক দেখে এবং তার আদবকায়দা দেখে মনে মনে আরও খুশি হলো।

খাওয়া-দাওয়ার পর জমিদার বললেন, 'চানু, শুধু হাঁস চুরি করেই আমার মেয়ে পাবে না। কাল রাত্রে আস্তাবল থেকে আমার ছয়টা ঘোড়া যদি চুরি করতে পারো তা হলে দেখা যাবে। ছ'জন সহিস কিন্তু ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাহারা দেবে, সেটা মনে রেখো।'

চানু বললো, 'আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখবো'খন।'

সোমবার রাত্রে জমিদারের আস্তাবলে ছ'জন সহিস ছ'টা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে আছে। বেজায় ঠাণ্ডা, রক্ত যেন জমে যেতে চায়, তাই প্রত্যেকের জামার পকেটে একটা করে মদের বোতল, খানিক পরে-পরে তারা একটু করে মদ খেয়ে গা গরম করে নিচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না, তাই সকলে মিলে মহা গল্প জুড়ে দিলো—চানুর জন্য আস্তাবলের দরজা খোলাই রেখেছিলো। রাত যতো বেশি হতে লাগলো ঠাণ্ডাটাও যেন বাড়তে লাগলো। মদে আর শানায় না, গায়ে কাঁপুনি ধরে গেলো। এমন সময় ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে একটা কদাকার বুড়ো এসে দরজায় উঁকি মেরে বললো, 'বাবা সকল, শীতে জমে গেলাম, একমুঠো খড় দাও তো। আস্তাবলের এক কোণে রাতটা পড়ে থাকি, তা না হলে বুড়ো মানুষ—শীতে মারাই যাবো।'

বুড়োর পিঠে ছ'টা থলে, মুখে প্রায় দু' আঙুল লম্বা দাড়ি—চেহারাটা কুৎসিতের একশেষ।

বুড়ো আস্তাবলের দরজায় উঁকি মেরে বললো, 'লক্ষ্মী বাপ আমার, বুড়ো মানুষ, শীতে মরে গেলাম, ঐ কোণটাতে একটু জায়গা দাও, একমুঠো খড় নিয়ে পড়ে থাকবো'খন।'

সহিসেরা ভাবলো, এলোই বা বুড়ো, বেচারি শীতে জমাট বেঁধে গেলো—'ও তো আর কোনো অনিস্ট করবে না।'

আস্তাবলের কোণে খড় পেতে বুড়ো বেশ আরামে বসলো। সহিসেরা দেখলো বুড়ো খানিক পরেই একটা কালো বোতল বের করে একটু মদ খেলো। তার মুখে তখন হাসি আর ধরে না। যেন সে খুবই আরাম বোধ করছে। সহিসদের বুড়ো বললো, 'বাবা, তোমাদের

সব বোধ করি শেষ করে ফেলেছো, তা আমার কাছে ঢের আছে। তবে কিনা তোমরা পাছে কিছু মনে করো তাই তোমাদের দিতে ভরসা পাচ্ছি না।' একে বেজায় শীত, তার ওপরে সত্যি সত্যি তাদের সব মদ শেষ হয়ে গেছে, বুড়োর কথা শুনে সহিসেরা যেন হাতে চাঁদ পেলো—'সে কী বুড়ো, তুমি যদি দাও তা হলে তো বেঁচে যাই—ঠাণ্ডায় মরে গেলাম।'

বুড়োর বোতলটি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেলো, তবুও সহিসদের শীত গেলো না। শয়তান বুড়ো তখন আর-একটা বোতল বের করে তাদের দিলো ; এ বোতলটার মদের সঙ্গে কী জানি মেশানো ছিলো, খাওয়া মাত্র সবক'টা সহিস ঘোড়ার পিঠে গদির উপরে বসেই নাক ডাকিয়ে ঘুম দিলো।

তখন বুড়ো উঠে সবক'টা সহিসকে খড়ের উপর শুইয়ে ঘোড়াগুলোর পায়ে মোজা পরিয়ে দিলো। তারপর সবগুলিকে নিয়ে একেবারে চানুদের বাইরের একটা ঘরে গিয়ে হাজির।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জমিদারমশায় প্রথমেই কী দেখলেন ? তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়েই চানু ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে আর পিছনে পিছনে অপর পাঁচটা ঘোড়াও চলেছে।

জমিদারমশায় অবাক হয়ে রইলেন, মনে মনে বললেন, 'গোল্লায় যা তুই চানু, আর যাদের চোখে ধুলো দিয়েছিস সে বেটারাও গোল্লায় যাক।' আস্তাবলে গিয়ে সহিস বেটাদের জাগাতে জমিদারমশায়কে বেগ পেতে হয়েছিলো।

সকালবেলা জমিদারমশায় খেতে বসেছেন, চানুকেও ডেকে এনেছেন। খেতে খেতে চানুকে বললেন, 'কতোগুলো বোকা পাঁঠার চোখে ধুলো দিয়েছো, এতে তেমন বাহাদুরি নেই। আচ্ছা আজ বেলা একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত আমি ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির সামনে ঘুরে বেড়াবো, নিও দেখি আমার ঘোড়াটা চুরি করে! তা হলে বুঝবো তুমি বাহাদুর এবং সত্যিই আমার জামাই হবার উপযুক্ত।'

চানু উত্তর করলো, 'যে আজ্ঞে, একবার চেষ্টা করে দেখবো'খন।'

একটার পর থেকে জমিদার ঘোড়ায় চড়ে পাইচারি করে করে কাহিল হয়ে পড়লেন, তিনটে বেজে গেলো, চানুর টিকিটাও দেখতে পেলেন না। মনে করলেন এবারে বাড়ি ফিরে যাবেন। এমন সময় তাঁর একটা চাকর পাগলের মতো হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে হাজির—'কর্তা, শীগ্‌গির বাড়ি যান, মা ঠাকরুনকে বুঝি বা আর দেখতে পেলেন না ; সিঁড়ির উপর

থেকে তিনি পড়ে গেছেন, বোধ করি, হাত-পা সব ভেঙে গেছে, তিনি অজ্ঞান হয়ে আছেন। আমি চললাম ডাক্তারের বাড়ি।'

জমিদারের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেলো, 'বলিস কীরে বেটা, কী সর্বনাশ! ডাক্তারের বাড়ি যে ঢের দূর—তুই আমার ঘোড়াটা নিয়ে ছোট্ শীগ্‌গির।' ঘোড়ায় চড়ে চাকর তখন ডাক্তারের বাড়ি ছুটলো।

জমিদারমশাই হোঁচট খেতে খেতে বাড়ি এসে উপস্থিত। বাড়ি এসে দেখলেন সাড়া-শব্দ কিছু নেই, সব চুপচাপ। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাড়ির ভেতর গেলেন, সেখানে বসবার ঘরে গিন্নি আর তাঁর মেয়ে দিব্যি আরামে বসে আছেন। ততোক্ষণে জমিদারমশায়ের চৈতন্য হলো। তিনি বুঝতে পারলেন, এসব চানু বেটারই চালাকি—বেটা তাঁকে আচ্ছা ঘোল খাইয়েছে।

খানিক পরেই দেখলেন, চানু তাঁর ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে। সেই চাকর বেটার কিন্তু আর কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেলো না। চাকর তাঁকে একটুও কেয়ার করে না, নাই বা করলো তাঁর চাকরি—চানু যে তাকে দশটা মোহর দিয়েছিলো, তা দিয়ে তার অনেক দিন চলবে।

পরের দিন চানু এলে জমিদার বললেন, 'তুমি বাপু এবারে নেহাত ফাঁকি দিয়েছো, ওতে তোমার উপর আমার বড়ো রাগ হয়েছে। যা হোক, আজ রাত্তিরে যদি আমাদের বিছানা থেকে চাদরখানা চুরি করতে পারো তাহলে কালকেই বিয়ের আয়োজন করবো।'

চানু বললো, 'আজ্ঞে আচ্ছা, একবার চেষ্টা করে দেখবো'খন, কিন্তু এবারেও যদি ফাঁকি দেন তাহলে কিন্তু আপনার মেয়েকেই চুরি করে নিয়ে যাবো।'

রাত্রে জমিদার আর তাঁর গিন্নি শুয়েছেন, দিব্যি জ্যোৎস্না, কাচের জানালার ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঘরে পড়েছে। জমিদারমশাই দেখলেন হঠাৎ যেন একটা মাথা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে যাচ্ছিলো, তাঁদের দেখতে পেয়েই আবার সরে পড়লো।

জমিদার গিন্নিকে বললেন—'দেখলে তো? এ বেটা নিশ্চয় চানু।' তারপর বন্দুকটা হাতে করে নিয়ে বললেন, 'দেখো, আমি বেটাকে এখনি চমকিয়ে দিচ্ছি।'

বন্দুক দেখে জমিদার-গিন্নি ব্যস্ত হয়ে বললো, 'করো কি, চানুকে গুলি করবে নাকি?'

জমিদার বললেন, 'আরে না না, তুমি কি পাগল হলে নাকি? বন্দুকে কি আর গুলি পুরেছি—শুধু বারুদ।'

খানিক পরেই আবার জানালায় মাথা উঁকি মারলো, দড়াম্ করে জমিদার বন্দুক ছুঁড়ে

দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাওয়া গেলো ধপ্ করে একটা কি নিচে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লেগেছে।

জমিদার-গিন্নি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হায় ভগবান, বেচারি বোধ করি মরে গেছে, আর না হয় জন্মের মতো খোঁড়া কানা হয়ে থাকবে।'

জমিদারমশায়ও কেমন জানি থতমত খেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন—দরজা খোলাই পড়ে রইলো। জমিদারমশায় বোধ করি তখনও বাইরে জানালার কাছে পৌঁছোন নি, কিন্তু গিন্নিঠাকরুন শুনলেন, কর্তা ফিরে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন—'শীগ্‌গির বিছানার চাদরখানা দাও, বেটা মরে নি বোধ হয়, কিন্তু বেজায় রক্ত পড়ছে—একটু পরিষ্কার করে বেঁধে-টেঁধে ওকে ঘরে নিয়ে আসবো।'

গিন্নিঠাকরুন এক টানে চাদরখানা বিছানা থেকে তুলে দরজায় ছুঁড়ে দিলেন। চাদর
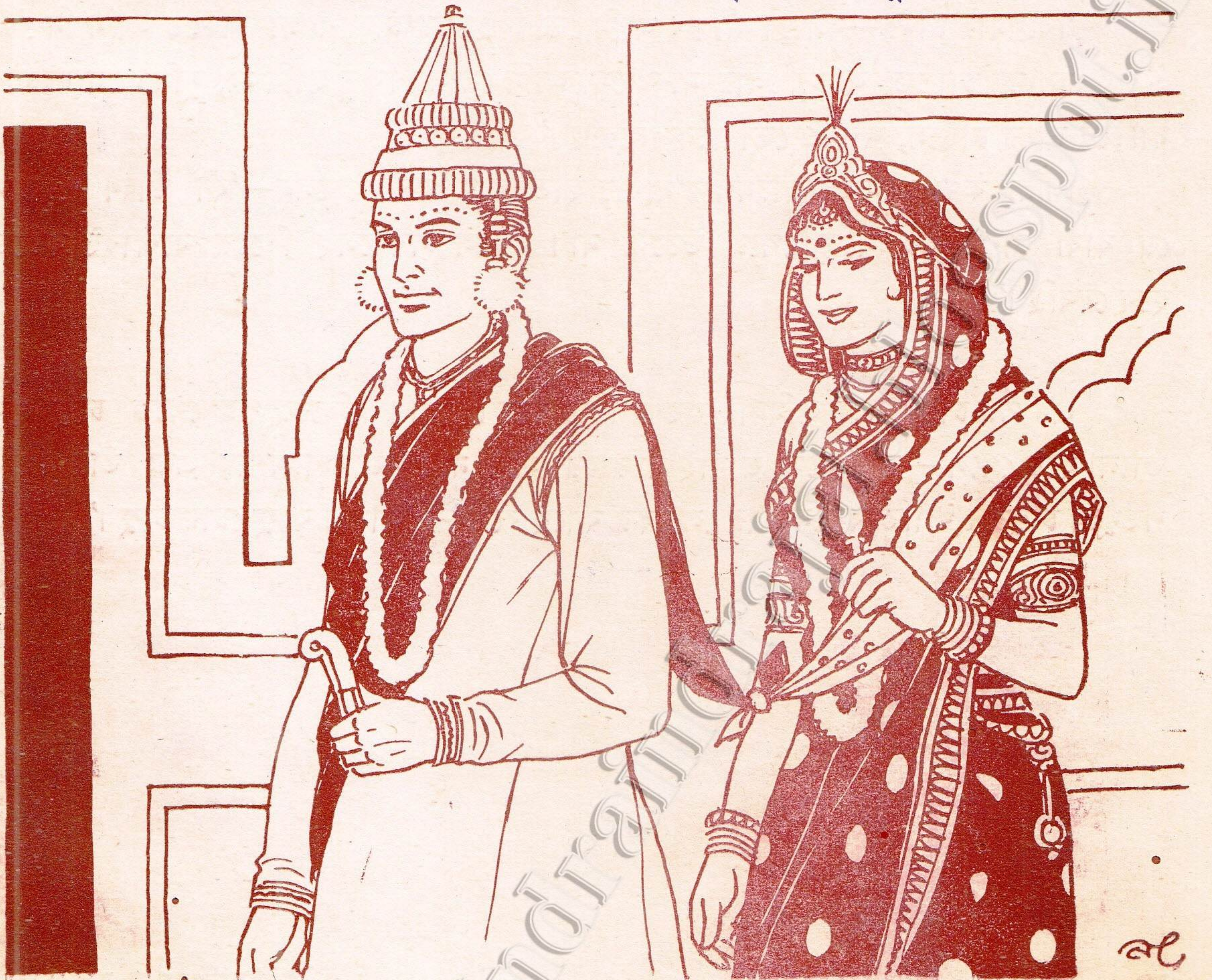
নিয়ে জমিদারমশায় আবার ছুটলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই মুহূর্তেই তিনি ফিরে এসে ঘরে উপস্থিত—সে সময়ের মধ্যে বাগানে জানালার কাছে গিয়ে ফিরে আসা একেবারে অসম্ভব।

ঘরে ঢুকেই জমিদার রেগে-মেগে বলতে লাগলেন—'বেটা পাজি চানু, তোকে ফাঁসি দেওয়া উচিত।'

কর্তার কথা শুনে গিন্নি অবাক হয়ে বললেন,—'বেচারির বেজায় লেগেছে, আর তুমি কিনা তাকে গালাগালি দিচ্ছো!'

'ওর বাস্তবিক লাগাটাই উচিত ছিলো। বেটার বদমাইসি দেখেছো? খড় দিয়ে একটা মানুষ বানিয়ে সেটাকে কাপড়-চোপড় পরিয়ে বেটা এনে জানালায় ধরেছিলো।'

'কী ছাই বলছো, আমি বুঝতেই পারছি না। খড়ের মানুষ হলে তার রক্ত মুছবার জন্য আবার বিছানার চাদরটা নিয়ে গেলে কেন?'

'বিছানার চাদর—বলছো কী! আমি তো বিছানার চাদর-টাদর চাইতে আসি নি!'

'চাদর চাইতে আসো আর না-আসো আমি সে-সব কিছু জানি না, তুমি এসে দরজায় দাঁড়িয়ে চাদর চাইলে, আমিও তোমাকে দিয়েছি।'

গিন্নির কথা শুনে জমিদারমশায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—'কী ভীষণ শয়তান রে বাবা চানু—ওর সঙ্গে পেরে উঠবো না। কাল সকালেই বিয়ের বন্দোবস্ত করতে হবে দেখছি।'

এর পর চানুর সঙ্গে জমিদার-কন্যার বিয়ে হয়ে গেলো। বিয়ের পর থেকে চানু খুব ভালো হয়ে গেলো—তার মতো জামাই সচরাচর মেলে না। জমিদারমশায় এবং তাঁর গিন্নি শতমুখে চানুর সুখ্যাতি করেন আর লোকের কাছে বলেন—'আমার ঝানু চোর চানু।'

জাপানী দেবতা

জাপানদেশে 'কোজিকী' বলে একখানা পুরনো পুথি আছে। তাতে লেখা আছে যে, পৃথিবীটা যখন হয়েছিল, তখন সেটা তেলের মতো পাত্‌লা ছিলো, আর ফেনার মতো সমুদ্রে ভেসে বেড়াতো।

তখন নাকি মোটে তিনটি দেবতা ছিলেন। এই তিনটি মরে গেলে আর দুটি হলেন; তাঁরা মরে গেলে আর দুটি,—তাঁরা মারা গেলে আবার দশটি দেবতা হলেন।

এই দশটি দেবতার একজন ছিলেন 'ইজানাগী'; তাঁর স্ত্রীর নাম ছিলো 'ইজানামী'।

অন্য দেবতারা এঁদের

দুজনের হাতে একটা শূল দিয়ে বললেন, 'তোমরা এই তেলের মতন জিনিসটা থেকে পৃথিবী তৈরী করো।'

ইজানাগী আর ইজানামী বললেন, 'আচ্ছা।' বলে তাঁরা সেই শূল দিয়ে সমুদ্রটাকে ঘাঁটতে লাগলেন। তারপর যখন শূল তুললেন, তখন তার মুখ বেয়ে যে জল পড়েছিল, তাই থেকে একটা দ্বীপ হলো, তার নাম 'ওনগরো'। এই ওনগরো দ্বীপে একটি সুন্দর বাড়ি তৈরী করে, তার ভিতরে ইজানাগী আর ইজানামী বাস করতে লাগলেন। সেইখানে থেকেই তাঁরা জাপান

দেশটাকে গড়েছিলেন। এই দেশকে আমরা বলি 'জাপান', কিন্তু সে দেশের লোকেরা বলে 'নিপ্পন' বা 'দাই নিপ্পন'।

ইজানাগী আর ইজানামীর অনেক ছেলে-মেয়ে, তার মধ্যে 'আগুন-দেবতা' একজন। এই দেবতার জন্মের সময় ইজানামী মরে গেলেন। তখন মনের দুঃখে ইজানাগী চোখের জল ফেলতে লাগলেন, সেই চোখের জল থেকে 'কান্না-পরীর' জন্ম

হলো। কাঁদতে কাঁদতে শেষে ইজানাগীর রাগ হলো। তখন তিনি তলোয়ার দিয়ে আগুন-দেবতার মাথা কেটে ফেললেন, তাতে সেই কাটা দেবতার শরীর আর রক্ত হতে ষোলোটা দেবতা উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু ইজানাগীর মনের দুঃখ তাতেও ঘুচল না। শেষে তিনি ইজানামীকে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে পাতালে উপস্থিত হলেন,—সেই যেখানে মৃত্যুর পরে সকলকেই যেতে হয়। পাতালের ভিতর মস্ত পুরী আছে, সেই পুরীর দরজায় গিয়ে ইজানামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। ইজানামী তাঁকে বললেন, 'একটু দাঁড়াও, আমি জিজ্ঞাসা করে আসি, তারপর তোমার সঙ্গে যাবো।' এই বলে ইজানামী ভিতরে গেলেন। ইজানাগী খানিক বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, শেষে ইজানামীর দেরি দেখে তিনিও ভিতরে গেলেন। ভিতরে যেতেই এমনি ভয়ানক গন্ধ এসে তাঁর নাকে লাগল যে কী বলবো! এমন ভয়ংকর নোংরা জায়গার কথা কেউ ভাবতেও পারে না; আর সেখানে থেকে থেকে ইজানামীও এমন নোংরা হয়ে গিয়েছেন যে তাঁর কাছে যাবার সাধ্য নেই। এসব দেখে ইজানাগী নাকে হাত দিয়ে সেখান থেকে ছুটে পালালেন। পেয়াদাগুলো তাঁকে পালাতে দেখে 'ধর্ ধর্' ব'লে তাড়া করেছিলো, কিন্তু ধরতে পারে নি।

কী বিষম গন্ধই সে জায়গার ছিলো, দেশে ফিরেও ইজানাগীর গা থেকে সে গন্ধ গেলো না। গন্ধে অস্থির হ'য়ে তিনি নদীতে স্নান করতে গেলেন। সেই সময়ে তাঁর কাপড় আর গা থেকে অনেকগুলি দেবতা বেরিয়েছিলেন।

এঁদের মধ্যে একটি মেয়ে ইজানাগীর বাম চোখ দিয়ে বেরিয়েছিলেন, সেটি এমন সুন্দর যে তেমন আর কেউ কখনো দেখে নি। সেই মেয়েটির নাম 'গগন-আলো', তিনি সূর্যের দেবতা।

ইজানাগীর ডান চোখ দিয়ে আর একটি সুন্দর দেবতা বেরিয়েছিলেন, তাঁর নাম 'তেজোবীর'।

তখন ইজানাগী তাঁর নিজের গলার হার গগন-আলোর গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'মা, তুমি হলে স্বর্গের রানী।'

চন্দ্রপতিকে তিনি বললেন, 'তুমি হলে রাত্রির রাজা।' আর তেজোবীরকে বললেন, 'তুমি হলে সমুদ্রের রাজা।' তখন গগন-আলো গিয়ে স্বর্গের রানী হলেন, চন্দ্রপতি গিয়ে রাত্রির রাজা হলেন। কিন্তু তেজোবীর সেইখানে বসে-বসেই কাঁদতে লাগলেন। দিন নেই,

ঘাত নেই, কেবলই গালে হাত দিয়ে কান্না। তাঁর দাড়ি লম্বা হয়ে ভুঁড়িতে গিয়ে ঠেকলো, তবু তাঁর কান্না থামলো না।

ইজানাগী বললেন, 'আরে, তোর হলো কী? রাজ্য দিলাম, রাজ্যে গেলি না, খালি যে কাঁদছিস?'

তেজোবীর বললেন, 'আমি রাজ্য চাই না। আমি সেই পাতালে মার কাছে যাবো।'

ইজানাগী বললেন, 'তবে যা বেটা তুই এখান থেকে দূর হয়ে।' বলে তিনি তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন।

তখন তেজোবীর স্বর্গে গিয়ে গগন-আলোর কাছে উপস্থিত হলেন। গগন-আলো জানতেন, তাঁর মন ভালো নয়, কাজেই তিনি তাঁকে দেখে ভাবলেন, 'না-জানি কেন এসেছে!'
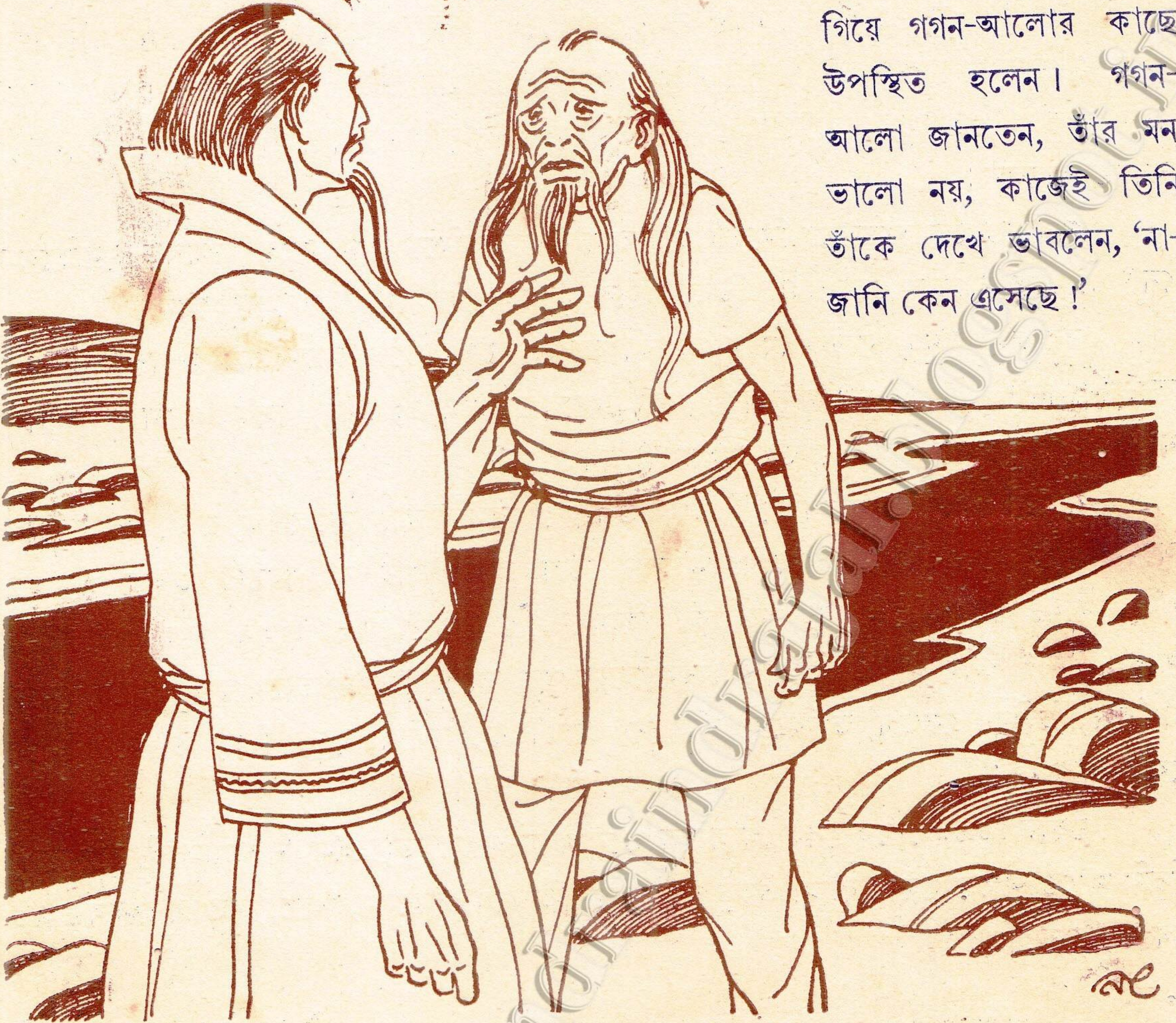
তেজোবীর কিন্তু বললেন, 'বাবা তাড়িয়ে দিয়েছেন, তাই মার কাছে চলেছি। যাবার আগে তোমাকে দেখতে এলাম।'

গগন-আলো বললেন, 'তাই যদি হয়, তবে তোমার তলোয়ারখানা দাও তো।'

তেজোবীরের কাছ থেকে তলোয়ার নিয়ে গগন-আলো সেটাকে চিবিয়ে গুঁড়ো ক'রে ফেললেন। সেই গুঁড়ো থেকে তিনটি দেবতা জন্মালেন।

তখন তেজোবীর বললেন, 'আচ্ছা, এখন তোমার গহনাগুলি দাও তো।' গহনা নিয়ে তিনি চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেললেন, আর সেই গুঁড়ো থেকে পাঁচটি দেবতা জন্মালেন।

এখন, এই যে সব দেবতা হলেন, এঁরা কার ? গগন-আলো বললেন, 'তোমার তলোয়ার থেকে যারা হয়েছে, তারা তোমার ; আর আমার গহনা থেকে যারা হয়েছে, তারা আমার।'

কথাটা তো বেশ ভালোই বলা হয়েছিলো, কিন্তু হলে কী হয়, গগন-আলোর গহনা থেকেই যে বেশী দেবতা হয়েছিলো, কাজেই সে-কথা তেজোবীরের পছন্দ হলো না। তাতে তিনি বিষম চটে গিয়ে গগন-আলোর ক্ষেত মাড়িয়ে, খাল বুজিয়ে, বাগান ভেঙে, বিষম দৌরাত্ম্যি আরম্ভ করলেন।

পর্বতের গুহার ভিতরে নিজের ঘরে বসে সখীদের নিয়ে গগন-আলো কাপড় বুনছিলেন, সেই ঘরের ছাদ ভেঙে তেজোবীর ভিতরে ছাল-ছাড়ানো মরা ঘোড়া ফেলে দিলেন।

কাজেই তখন আর গগন-আলো কী করেন, তিনি তেজোবীরের ভয়ে গুহার দরজা বন্ধ করে দিলেন। তিনিই হলেন সূর্যের দেবতা, আলোর মালিক ; এখন, সেই আলোর মালিক যখন গুহায় লুকোতে গেলেন, তখন কাজেই জগৎসংসার অন্ধকার হয়ে গেল।

সকলে বললো, 'সর্বনাশ ! এখন উপায় ?' তখন তারা করল কি, তারা সবাই মিলে অনেক যুক্তি করে একখানা চমৎকার আরশি তৈরী করল, আর যারপরনাই সুন্দর একছড়া মণির মালা গড়ালো, আরো কত কী জিনিস খুঁজে নিয়ে এলো। সেই সব জিনিস সেই আরশি আর সেই মালা দিয়ে গগন-আলোর পূজা করে, তারপর তারা হেসে, গেয়ে, নেচে, লাফিয়ে, চেঁচিয়ে, মোরগ ডাকিয়ে, কী যে একটা সোরগোল জুড়ে দিল, তা না শুনলে বোঝা যায় না।

গুহার ভিতর থেকে সেই গোলমাল শুনে গগন-আলো ভাবলেন, 'না-জানি কী হয়েছে।' তিনি আস্তে আস্তে গুহার দরজা একটু ফাঁক করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরে, তোরা কিসের এত গোলমাল করছিস ?'

তারা বললো, 'গোলমাল করবো না? দেখো এসে, তোমার চেয়ে কত সুন্দর একটি মেয়ে পেয়েছি!' বলেই সেই আরশিখানা এনে তাঁর সামনে ধরলো।

সেই আরশির ভিতরে নিজের সুন্দর মুখখানি দেখে আর সূর্যের দেবতা লুকিয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি তখনি ছুটে বেরিয়ে এলেন—আর অমনি সকলে গিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে হুড়্‌কো এঁটে দিলো।

তখন আবার সূর্য উঠলো, আবার আলো হলো, আবার সংসারে সুখ এলো। তারপর সবাই মিলে সেই দুষ্ট তেজোবীরকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলো।

সেখান থেকে তাড়া খেয়ে, তেজোবীর ঘুরতে ঘুরতে হী-নদীর ধারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে দুটি বুড়োবুড়ি একটি ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে বসে কাঁদছিল, তাদের দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কাঁদছো কেন? কী হয়েছে?'

বুড়োটি বললো, 'বাবা, আমার দুঃখের কথা শুনে কী করবে? আমার আটটি মেয়ে ছিলো, তার সাতটিকে অজগরে খেয়েছে, এই একটি আছে। সে বড় ভয়ংকর অজগর, তার আটটা মাথা। বছরে একবার করে আসে, আর আমার এক একটি মেয়েকে খেয়ে যায়। আবার তার আসবার সময় হয়েছে, এবারে এটিকেও খাবে, তাই আমরা কাঁদছি।'

তেজোবীর বললেন, 'এই কথা? আচ্ছা তোমাদের কোনো চিন্তা নেই, আমি যা বলছি, তাই করো। আট জালা খুব কড়া রকমের সাকী (জাপানী মদ) তৈরী করো তো। করে, ঐ জায়গায় রেখে দাও, তারপর দেখো কী হয়।'

বুড়ো সেই দিনই আট জালা সাকী তৈরী করে তেজোবীরের কথামত সাজিয়ে রেখে দিলো; সাকীর গন্ধে চারিদিক ভুরভুর করতে লাগল। ঠিক সেই সময় অজগর গড়াতে গড়াতে আর ফোঁস ফোঁস করতে করতে এসে উপস্থিত হয়েছে, আর, সকলের আগে সেই সাকীর গন্ধ গিয়েছে তার নাকে। আর কি সে বেটা তার লোভ সামলাতে পারে? সে অমনি আট জালায় আট মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে সাকী খেতে লাগল। খেতে খেতে তার চোখ বুজে এলো, মাথা ঢলে পড়লো, তবু তার হুঁশ নেই, সে চোঁ-চোঁ করে খাচ্ছেই। শেষে ঘুমে অচেতন হয়ে একেবারে মাটিতে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। তা দেখে তেজোবীর বললেন, 'আর কী? এই বেলা!' বলেই তিনি তাঁর তলোয়ার নিয়ে এসে সেটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললেন। তার লেজটা কিন্তু ভারী শক্ত ঠেকলো। সেটা কিছুতেই কাটা গেলো না, বরং তাঁর তলোয়ারই ভেঙে গেলো। তখন তেজোবীর খুঁজে দেখলেন যে সেই লেজের ভিতরে

আশ্চর্য রকমের একখানা তলোয়ার রয়েছে। তিনি তখনি সেই তলোয়ারখানা বার ক'রে নিলেন।

তখন তো সকলেরই খুব সুখ হলো। তারপর বুড়োর মেয়েকে বিয়ে করে, সেই দেশে সুন্দর বাড়ি তৈরী করে, দুজনে সুখে বাস করতে লাগলেন। আর সেই বাড়িতে যারপরনাই আদরযত্নে থেকে বুড়োবুড়িরও শেষ কাল খুব আরামেই কাটলো।

গগন-আলোর যে নাতি, তাঁর ছিল তিন ছেলে ; দীপ্তানল, ক্ষিপ্তানল আর তৃপ্তানল।

দীপ্তানল মাছ ধরেন আর তৃপ্তানল শিকার করেন। একদিন তৃপ্তানল দীপ্তানলকে বললেন, 'দাদা, চলো না, তোমার কাজটা আমি করি, আর আমার কাজটা তুমি করো,—দেখি কেমন হয়।' বলে, নিজের তীরধনুক দাদাকে দিয়ে, দাদার বঁড়শি আর ছিপ তিনি চেয়ে নিলেন। নিয়ে মাছ তো ধরলেন খুবই, লাভের মধ্যে বঁড়শিটা মাছে ছিঁড়ে নিয়ে গেলো।

তারপর একদিন দীপ্তানল বললেন, 'ভাই, শখ কি মিটেছে ? এখন কেন আমার বঁড়শি আর ছিপ আমাকে ফিরিয়ে দাও না।' তাতে তৃপ্তানল ভারি লজ্জিত হয়ে বললেন যে, 'দাদা, বঁড়শি তো মাছে নিয়ে গেছে, এখন কী করে দিই ?' এ কথায় দীপ্তানল যারপরনাই রেগে বললেন যে, 'সে আমি জানি না ; আমার বঁড়শি আমাকে এনে দাও।'

তখন তৃপ্তানল আর কী করেন, নিজের তলোয়ারখানা ভেঙে টুকরো টুকরো ক'রে তাই দিয়ে বঁড়শি বানিয়ে দাদাকে দিলেন। কিন্তু দাদার তাতে মন উঠলো না ; তিনি বললেন, 'ও আমি চাই না ; আমার যে বঁড়শি নিয়েছো তাই এনে আমাকে দাও।'

তৃপ্তানল হাজার বঁড়শি এনে দীপ্তানলকে দিতে গেলেন, তাতেও হলো না। দীপ্তানল আরো রেগে গিয়ে বললেন, 'আমার সেই বঁড়শিটি আমাকে এনে দিতে হবে।' তা শুনে তৃপ্তানল মাথা হেঁট করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সেখান থেকে চলে গেলেন। ভাবলেন, 'হায় হায়! এখন আমি কী করি ? সমুদ্রের মাছে বঁড়শি নিয়ে গেছে, তাকে আমি কোথায় খুঁজে পাবো ?'

এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসে কাঁদছেন, এমন সময় সমুদ্রের দেবতা লবণেশ্বর সেইখানে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কী হয়েছে বাছা ? তুমি কাঁদছো কেন ? তৃপ্তানল বললেন, 'দাদার বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে এসেছিলাম, সেটা মাছে নিয়ে গেছে। তাতে দাদা বড্ড রাগ করেছেন। আমি আরও কতো বঁড়শি তাঁকে দিতে গেলাম, তিনি নিলেন না, বললেন, আমার সেইটে এনে দাও। এখন আমি কী করি ?' লবণেশ্বর

বললেন, 'তুমি কেঁদো না, আমি যা বলছি তাই করো।' বলে, তিনি তখনি একখানা নৌকা তৈরী করে তৃপ্তানলকে তাতে বসিয়ে দিলেন, আর বললেন, 'এই নৌকায় চড়ে তুমি এই পথ দিয়ে যেতে থাকবে। খানিক দূর গিয়ে মাছের আঁশ দিয়ে গড়া একটা বাড়ি দেখতে পাবে, সেইখানে সমুদ্রের রাজা সিন্ধুপতি থাকেন। সেই বাড়ির পাশে, বাগানের ভিতরে, কুয়োর ধারে একটা গাছ আছে ; তার আগায় উঠে তুমি বসে থাকবে। সেই বাগানে রাজার মেয়ে বেড়াতে আসে, সে তোমাকে তোমার বঁড়শির কথা বলে দেবে।'

এ কথায় তৃপ্তানল সেই নৌকা বেয়ে, সেই রাজার বাড়িতে গিয়ে সেই গাছে উঠে বসে রইলেন। খানিক বাদে রাজার মেয়ের দাসীরা কলসী হাতে করে সেই কুয়ো থেকে জল নিতে এলো। এসে তারা দেখলো যে গাছের উপরে

কেমন সুন্দর এক রাজপুত্র বসে আছে। তৃপ্তানল তাদের বললেন, 'হ্যাঁ গা, তোমরা দয়া করে আমাকে একটু জল খেতে দেবে?' দাসীরা অমনি সোনার গেলাসে জল এনে তাঁকে খেতে দিলো। তিনি তা থেকে একটুখানি জল খেলেন। তার-পর গেলাস ফিরিয়ে দেবার সময় নিজের গলা থেকে মণি খুলে তার ভিতর ফেলে দিলেন। দাসীরা তা দেখতে পায় নি, তারা সেই মণিসুদ্ধ গেলাস নিয়ে রাজার মেয়ের ঘরে রেখে দিয়েছে।

তারপর রাজার মেয়ে জল খাবার জন্য গেলাস খুজতে এসে বললেন—'এ কী! গেলাসের ভিতর মণি কোত্থেকে এল রে?' দাসীরা বললো, 'তা তো আমরা জানি না, কুয়োর ধারে এক রাজপুত্র বসে আছে, সে আমাদের কাছে জল খেতে চাইল, আমরা এই গেলাসে করে নিয়ে তাকে জল খেতে দিলাম। মণি হয়তো তারই হবে।'

রাজার মেয়ে তখনি ছুটে গিয়ে তাঁর বাবাকে সব কথা বললেন। রাজা সিন্ধুপতিও এ কথা শুনেই তাড়াতাড়ি সেই কুয়োর ধারে চলে এলেন। এসে সেই গাছের উপরে তৃপ্তানলকে দেখেই তিনি যারপরনাই আশ্চর্য আর খুশী হয়ে বললেন, 'আরে, তোমার নাম না তৃপ্তানল? আমাদের স্বর্গের রানী গগন-আলোর নাতির ছেলে! তুমি কেন কুয়োর ধারে বসে থাকবে বাবা? এসো এসো, ঘরে এসো!' বলে, তাঁকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে সভায় নিয়ে এলেন। সভার লোক তাঁর

নাম শুনেই ব্যস্ত হয়ে উঠে তাঁকে সেলাম ক'রে জোড় হাতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর রাজা অনেক ধুমধাম করে তাঁর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন।

তারপর থেকে বেশ সুখেই দিন যায়। রাজা রোজই খবর নেন, তৃপ্তানল কেমন আছেন ; রাজার মেয়ে বলেন, 'বেশ ভালো আছেন।' এমনি করে তিন বৎসর চলে গেলো। তারপর একদিন রাজা খবর নিতে এসে শুনলেন যে, তৃপ্তানল বিছানায় শুয়ে একটা খুব লম্বা নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

অমনি রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা, তুমি কেন নিঃশ্বাস ফেলেছিলে ? তোমার কিসের দুঃখ ?' তৃপ্তানল বললেন, 'দাদার বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে এসেছিলাম, সেই বঁড়শি মাছে নিয়ে গেছে। এতে দাদার বড্ড রাগ হয়েছে, আর বলেছেন যে সেই বঁড়শি তাঁকে ফিরিয়ে না দিলে কিছুতেই হবে না।' শুনে রাজা

বললেন, 'এই কথা ? আচ্ছা,—ডাক্ তো রে সকল মাছকে !' রাজার হুকুমে পৃথিবীর যত মাছ সকলে এসে তাঁর কাছে হাজির হলো, আর রাজা তাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলো তো, তোমাদের কার গলায় সেই বঁড়শি আটকেছিল ?' তারা সকলে বললে যে, 'তাইমাছের গলায় সেই বঁড়শি আটকেছিল। আজও তার খোঁচা লাগে।' তখন রাজামশায় তাইকে বললেন, 'হাঁ কর্ ব্যাটা, দেখি তোর গলায় কী আছে !' এ কথায় তাই যেই 'অ-অ-অ-আ-ক্ !' করে দু'হাত চওড়া হাঁ-টি করেছে, অমনি দেখা গেলো যে ঠিক সেই বঁড়শিটি গলায় বিঁধে রয়েছে। অমনি চিমটা দিয়ে সেটিকে বার করে আনা হলো। তখন তো আর তৃপ্তানলের আনন্দের সীমাই রইল না। রাজামশাই তাঁর হাতে সেই বঁড়শিটি দিয়ে আরো দুটি মানিক তাঁকে দিলেন। তার একটির নাম জোয়ার-মানিক ; তাকে ছুঁড়ে মারলে সমুদ্র ছুটে এসে শত্রুকে ডুবিয়ে দেয়। আর একটির নাম ভাঁটা-মানিক ; তাকে ছুঁড়ে মারলে সেই সমুদ্র ফিরে চলে যায়।

তারপর কুমিরের রাজাকে ডেকে সিন্ধুপতি বললেন, 'তুমি তৃপ্তানলকে তার দেশে পৌঁছিয়ে দিয়ে এসো। দেখো যেন তার কোনো কষ্ট না হয়।'

সেই পাহাড়ের মতো কুমির তৃপ্তানলকে পিঠে করে তাঁর দেশে পৌঁছিয়ে দিয়ে এলো। তারপর দীপ্তানলকে তাঁর বঁড়শি ফিরিয়ে দিতে আর বেশীক্ষণ লাগলো না। কিন্তু দীপ্তানল কোথায় তাঁর বঁড়শি পেয়ে খুশী হবেন, না, তিনি আরো রেগে তলোয়ার নিয়ে তৃপ্তানলকে কাটতে গেলেন। তখন তৃপ্তানল আর কী করেন, তাড়াতাড়ি সেই জোয়ার-মানিকটি ছুঁড়ে মারলেন। মারতেই তো সমুদ্রের জল পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে এসে দীপ্তানলকে ভাসিয়ে নিয়ে চললো। তখন আর তিনি যাবেন কোথায় ? ঢক্-ঢক্ করে জল খেতে খেতে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'রক্ষে করো ভাই ! আমার ঘাট হয়েছে, আমি আর অমন করবো না।' সে-কথায় তৃপ্তানল ভাঁটা-মানিক ছুঁড়ে জল সরিয়ে দিয়ে তাঁকে বাঁচালেন।

তারপর থেকে দীপ্তানল ভালোমানুষ হয়ে গেলেন, আর ছোট ভাইকে রাজ্য ছেড়ে দিলেন।

দৈত্যের কেট্‌লি

সমুদ্রের দেবতার বাড়িতে আর সব দেবতাদের নিমন্ত্রণ হয়েছে। রান্নার জোগাড়টা বেশ ভালো মতোই হচ্ছে, মুস্কিলের মধ্যে, তেমন বড় একটা কেট্‌লি পাওয়া যাচ্ছে না।

থর বললেন—কেট্‌লি আমি এনে

দিচ্ছি। হীমির দৈত্যের একটা কেট্‌লি আছে, সেটা একমাইল উঁচু, আর তেমনি চওড়া।

বলে, তখনি গাড়িতে ছাগল জুড়ে তাঁর ভাই টিউকে নিয়ে রওনা হলেন।

হীমির বাড়িতে ছিলো না, খালি মেয়েরা ছিলো, তাদের একজন দেখতে খুব সুন্দর, আরেক জনের ন-শো টা মাথা। ঘরের ভিতরে ছোট-বড় মেলাই কেট্‌লি মাচার উপর সাজানো ছিলো।

মেয়েরা বললো, 'তোমরা শিগগির গিয়ে একটা কেট্‌লির নিচে লুকিয়ে থাকো। দৈত্যের মেজাজটা বড্ড খিটখিটে, কতোজনকে ভেংচিয়েই মেরে ফেলেছে।

তাঁরা দু'ভাই তাই করলেন, আর তখনই দৈত্য এলো। তার গিন্নি তখন তাকে বললো,—ওগো, বাড়িতে লোক এসেছে।

তা শুনে সে সেই কেট্‌লিটার দিকে এমন ভয়ানক দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তাকাল যে তাতেই মাচা ভেঙে সব কেট্‌লি পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেলো, রইলো কেবল সকলের বড়োটা।

তারপর গিন্নি অনেক করে বুঝিয়ে বল্‌তে তার রাগটা একটু কমে এলো। তখন সে নিজেই গিয়ে তিনটে বড়ো বড়ো ষাঁড় মেরে আনলো, ভাবলো সকলে মিলে মজা করে খাবে। থর কিন্তু একলাই সেই ষাঁড়ের দুটোকে খেয়ে বসে আছেন!

তা দেখে দৈত্য বললো,—তুই তো দেখছি ভাই, বড্ড খেতে পারিস! আচ্ছা, কাল মাছ ধরে এনে তোকে ভালো করে খাওয়াবো।

পরদিন ভোরে উঠে দৈত্য গেছে সাগরের ধারে মাছ ধরতে, থরও তার পিছু পিছু সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন। থর বললেন,—আমিও মাছ ধরবো।

দৈত্য বললো,—ধরবি তো তোর টোপ নিয়ে আয়।

থর অমনি গিয়ে দৈত্যের সকলের বড়ো ষাঁড়টার মাথা কেটে বঁড়শিতে গেঁথে নিলেন।

তারপর দু'জনে নৌকায় উঠেছেন আর থর দাঁড় টানছেন। খানিকদূর গিয়ে দৈত্য বললো,—থাম, থাম। আর যেতে হবে না। থর তবুও হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে খালি দাঁড় টানছেন।

দৈত্য ব্যস্ত হয়ে বললো,—আরে থাম, থাম। আর একটু গেলেই সেই পৃথিবী-বেড়া সাপের উপরে গিয়ে উঠবে, তাহলেই আমাদের প্রাণটি যাবে।

থর ত সেই সাপকেই চান, সেইখানে গিয়ে তবে তিনি থামলেন। তারপর তিনি ষাঁড়ের মাথা গেঁথে বঁড়শি ফেলে বসে রইলেন। কখন সেই সাপ এসে খাবে।

দৈত্য ততক্ষণে দুটো তিমি ধরে বললো,—চল, নাস্তার জোগাড় হয়েছে।

এদিকে কিন্তু থরের বঁড়শিতে কিসে ধরেছে আর তিনিও মেরেছেন সাঁই করে বিষম এক খ্যাঁচ। তখন যে হুড়োহুড়িটা হলো তা সাংঘাতিক! থর বেশ বুঝতে পেরেছেন যে, আর কেউ নয়, সেই সাপ। আর ভাবছেন—বেটাকে টেনে তুলতেই হবে।

ওঃ! সে কী টানাটানি! টানের চোটে থর নৌকার তলা দিয়ে গলে গিয়ে একেবারে সমুদ্রের তলার উপরে দাঁড়িয়েছেন, তবুও ছাড়ছেন না।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শেষে যখন সাপের মাথা জলের উপর ভেসে উঠলো, তখন তিনি তাঁর হাতুড়ি তুলেই সেটাকে গুঁড়ো করতে যাচ্ছেন—এমন সময়ে দৈত্য ভয়ে থতমত খেয়ে তাঁর বঁড়শির সুতো কেটে দিলো। সে ভেবেছিলো বুঝি নৌকা ডুবে যাবে আর সাপ তাদের গিলে ফেলবে।

সুতো কেটে দিতেই তো সাপটা তখনই জলে ডুবে গেলো। থর তাতে যারপরনাই রেগে গিয়ে সেই হাতুড়ি দিয়ে ঠাঁই করে এক ঘা লাগালেন দৈত্য বেটার মাথায়। সে হাতুড়ির ঘায় পাহাড় গুঁড়ো হয়ে যায়, দৈত্যের কিন্তু তাতে কিছুই হলো না। সে খালি ঝপাস্ করে সমুদ্রে পড়ে, কয়েক ঢোক লোনা
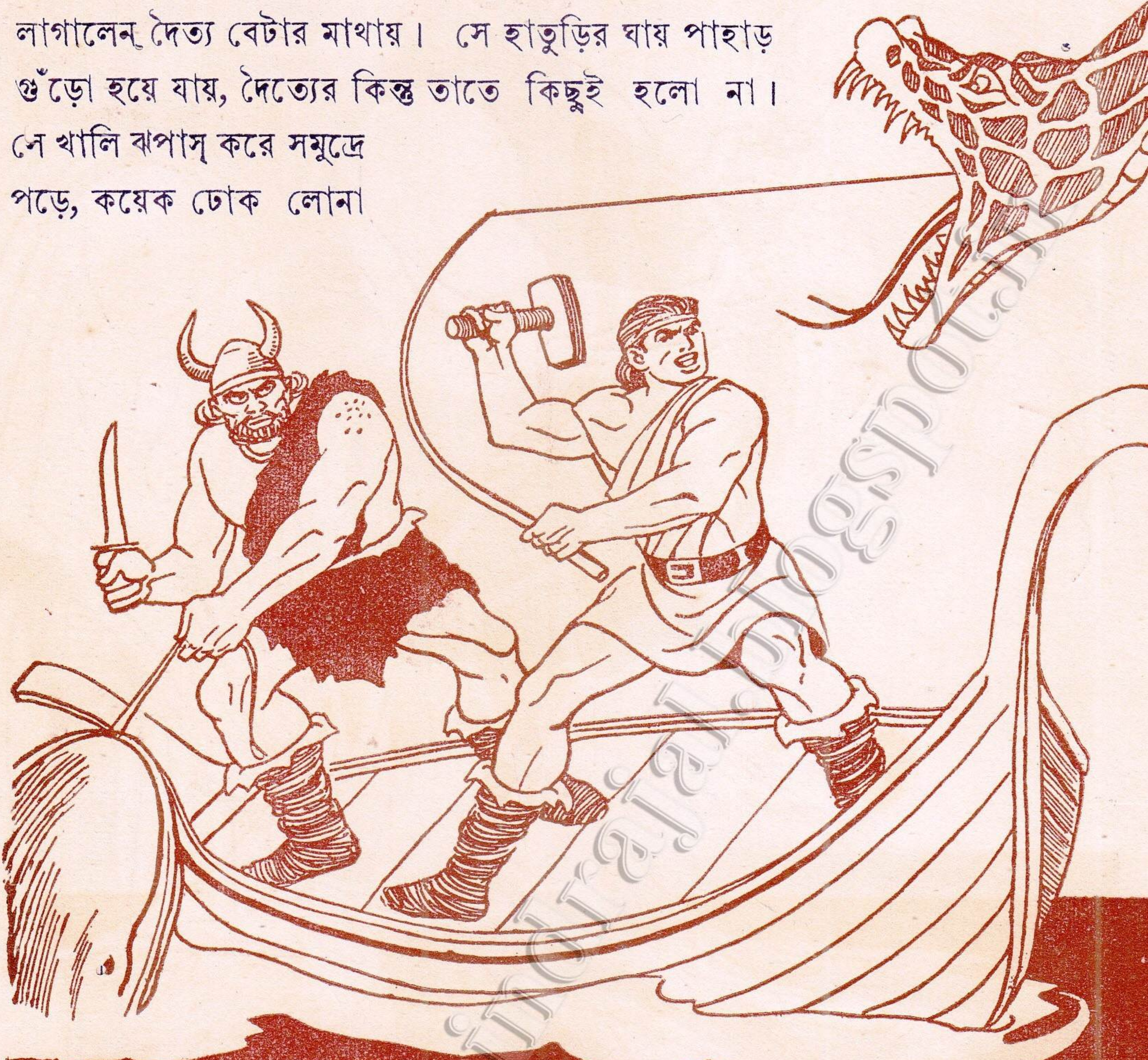
জল খেয়েই হেঁটে গিয়ে ডাঙায় উঠলো। থরও তখন নৌকা তীরে নিয়ে এলেন।

তারপর দৈত্য নিলো তিমি দুটি, থর নিলেন নৌকাখানি, এমনি করে তাঁরা বাড়ি ফিরে এলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর দৈত্য থরকে বললো,—ভাঙ তো দেখি আমার গেলাসটা, তোর গায়ে কেমন জোর। থর সেটাকে দেয়ালে ছুঁড়ে মারলেন, মেঝেতে ছুঁড়ে মারলেন, কিছুতেই তাকে বাঁকাতেও পারলেন না, কিন্তু দৈত্যের মাথায় মারতেই সেটা গুঁড়ো হয়ে গেল। সে বেটার মাথাটা সকলের চেয়ে শক্ত ছিলো!

তখন দৈত্য ভারি খুশি হয়ে বললো,—বাঃ! বাঃ! বেশ! আচ্ছা ভাই, তুই কেট্‌লি নিয়ে যা।

টিউ সে কেট্‌লি তুলে নিতে গেলেন কিন্তু সেটা এমনি ভারী যে তিনি তুলতেই পারলেন না। থরও সহজে পারেননি। তাঁর কোমরবন্ধটা যতোই আঁটতেন, ততই তাঁর জোর বাড়তো। কেট্‌লিটাকে তুলতে সেই কোমরবন্ধ এমনি করে আঁটতে হয়েছিলো যে আর একটুও আঁটবার জায়গা ছিলো না। শেষে কেট্‌লি তুলবার সময় এমনি কাণ্ড

হলো যে তাঁর পা মেঝেতে বসে গেলো। দৈত্যের বাড়িও ফেটে গেলো। তারপর সেই কেট্‌লি টুপির মতন করে মাথায় দিয়ে টিউকে নিয়ে সেখান থেকে চলে এলেন।
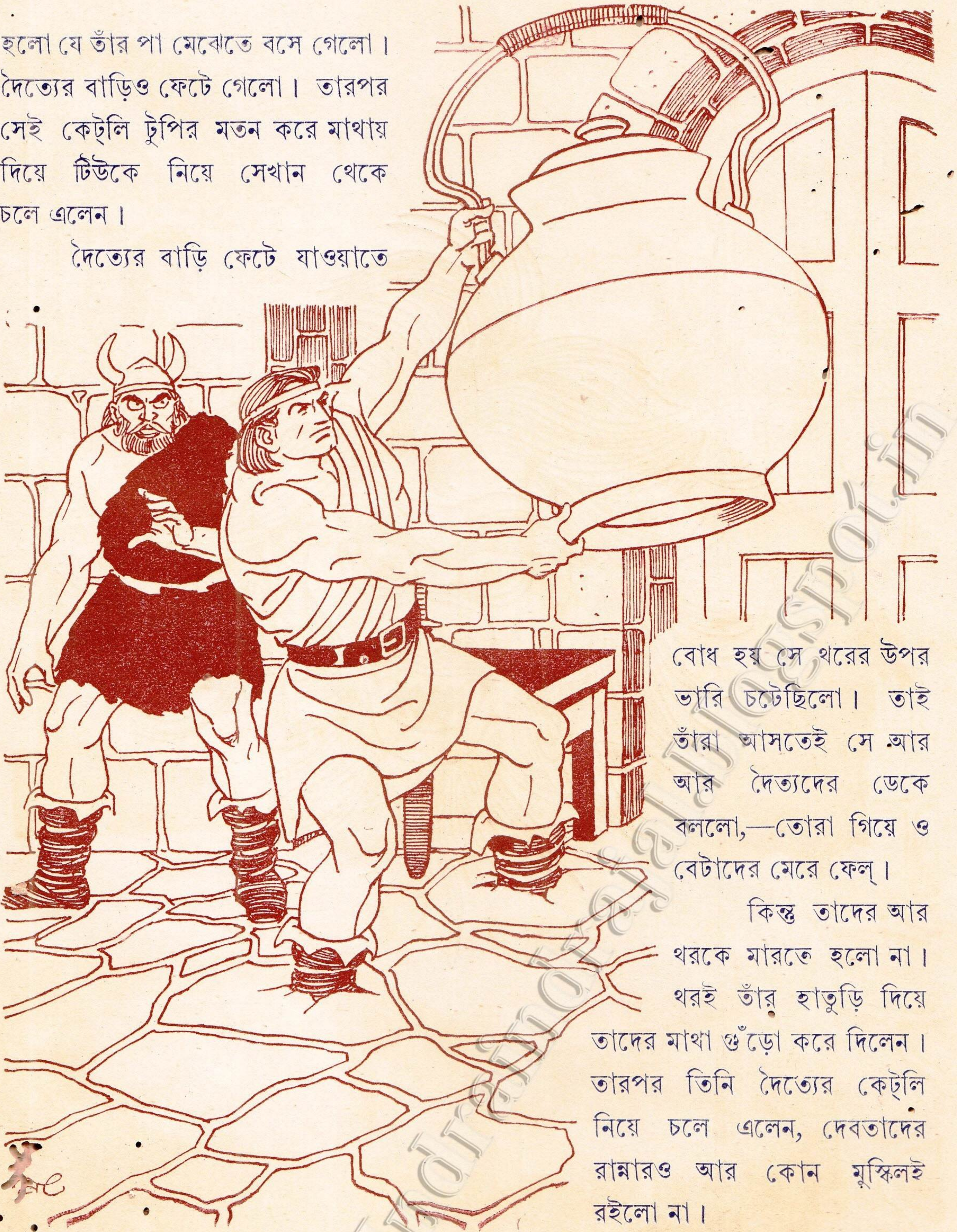
দৈত্যের বাড়ি ফেটে যাওয়াতে বোধ হয় সে থরের উপর ভারি চটেছিলো। তাই তাঁরা আসতেই সে আর আর দৈত্যদের ডেকে বললো,—তোরা গিয়ে ও বেটাদের মেরে ফেল্।

কিন্তু তাদের আর থরকে মারতে হলো না। থরই তাঁর হাতুড়ি দিয়ে তাদের মাথা গুঁড়ো করে দিলেন। তারপর তিনি দৈত্যের কেট্‌লি নিয়ে চলে এলেন, দেবতাদের রান্নারও আর কোন মুস্কিলই রইলো না।

ভূত-পেত্নী রাজা-রাণী আর রামায়ণ-মহাভারতই শুধু নয়, দৈত্য-দানব ওস্থর-দেবতা নিয়েও অনেক অনেক মজাদার গল্প লিখেছেন শিশু-সাহিত্যের রাজা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তাঁর এমনিধারা ক'টি গল্প নিয়ে বেরুলো এই 'দৈত্যের কেট্‌লি'। পাতায় পাতায় রঙিন ছবি দিয়ে সাজানো এই বইটি ছোটদের ভালো লাগলে আমরাও খুব খুশী হবো।

তার ভারী অসম্ভব মনে হ'লো। তারপর সে আবার ভালো ক'রে চেয়ে দেখলো যে, সেই লোকটার পা দু'খানিতে ঠিক ছাগলের পায়ের মতো খুর আছে। তখন আর বুঝতে বাকী রইলো না যে, সেই বুড়ো আর কেউ নয়, স্বয়ং শয়তান। শয়তানের পা ঠিক ছাগলের মতো হয়ে থাকে, এ কথা সেই কামার ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছিলো।

আর কেউ হলে তখনই সেখান থেকে ছুটে পালাতো। কিন্তু সেই কামার তেমন কিছু না ক'রে জোড় হাতে শয়তানকে নমস্কার ক'রে বললো, 'প্রণাম হই!'

শয়তান অমনি হাসতে হাসতে বললো, 'কী হে, কেমন আছো?'

কামার বললো, 'আজ্ঞে, কেমন আর থাকবো? দু'বেলা দু'টি ভাতও খেতে পাইনে।'

শয়তান বললো, 'বটে! তুমি এতোই কষ্ট পাচ্ছো? তুমি কেন আমার চাকরি করো না? আমি তোমাকে ঢের টাকা দেবো।'

ঢের টাকার নাম শুনে কামার তখনই শয়তানের কথায় রাজী হ'ল, যদিও সে জানতো যে, তার কাজে একবার ঢুকলে আর কেউ ছেড়ে আসতে পারে না। শয়তান তখন তাকে তিন থলি মোহর দিয়ে বললো, 'এখন গিয়ে এই টাকা দিয়ে খুব আরামে খাও-দাও; সাত বছর পরে আমি তোমার কাছে আসবো, তখন তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

এই বলে শয়তান চলে গেলো। কামারও হাসতে হাসতে টাকার থলি নিয়ে ঘরে ফিরলো।

সেই তিন থলি মোহর নিয়ে কামার যারপরনাই খুশি হয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি এলো। ভাবলো, এখন সাত বছর এই মোহর দিয়ে খুব ধুমধাম ক'রে নেবে।

যাতে একবার বসলে আর বিনা হুকুমে উঠবার জো নেই।
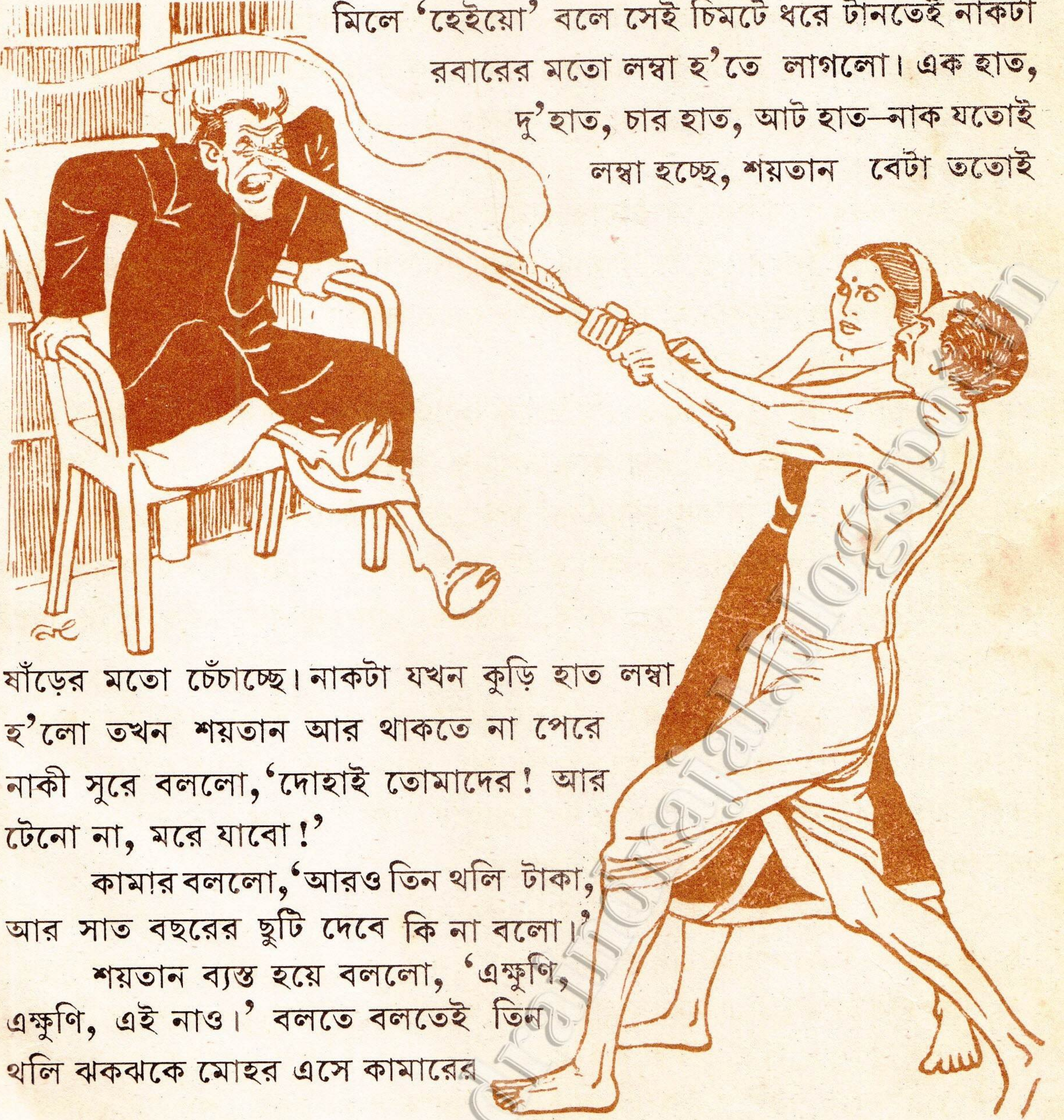
কামার দেখলো যে, শয়তান এবারে বেশ ভালোমতোই ধরা পড়েছে, হাজার টানাটানিতেও উঠতে পারছে না। তখন সে তার চিমটেখানি আগুনে তাতিয়ে নিয়ে তা দিয়ে আচ্ছা ক'রে তার নাকটা টিপে ধরলো। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে 'হেইয়ো' বলে সেই চিমটে ধরে টানতেই নাকটা রবারের মতো লম্বা হ'তে লাগলো। এক হাত, দু'হাত, চার হাত, আট হাত—নাক যতোই লম্বা হচ্ছে, শয়তান বেটা ততোই ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে। নাকটা যখন কুড়ি হাত লম্বা হ'লো তখন শয়তান আর থাকতে না পেরে নাকী সুরে বললো, 'দোহাই তোমাদের! আর টেনো না, মরে যাবো!'

কামার বললো, 'আরও তিন থলি টাকা, আর সাত বছরের ছুটি দেবে কি না বলো।'

শয়তান ব্যস্ত হয়ে বললো, 'এক্ষুণি, এক্ষুণি, এই নাও।' বলতে বলতেই তিন থলি ঝকঝকে মোহর এসে কামারের

আমাদের প্রকাশিত ছোটদের বই পড়ুন ও পড়ান ঃ

জীবজন্তুর কথা	সুকুমার রায়
খাই খাই	ঐ
পাগলা দাশু	ঐ
আবোল-তাবোল (বাঁধাই ও পেপার)	ঐ
নতুন ছেলে নটবর	লীলা মজুমদার
পিলে পটকা ও পুতুলের বিয়ে	কাজী নজরুল ইসলাম
এণ্ডারসেনের অমর গল্প	দেবদাস দাশগুপ্ত
চৈতন চুটকি	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কানকাটা রাজার দেশে	ঐ
রাক্ষস-খোক্কস দৈত্য-দানো	[বিখ্যাত লেখকদের শ্রেষ্ঠ রচনা]
ভূত-পেত্নী রাজা-রানী	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
বাঘ-শিয়ালের মেলা	ঐ
অথৈ জলের রাজপুরী	ঐ
দৈত্যের কেট্‌লি	ঐ
বাঘের মন্তর	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মায়াকানন	বনফুল
অলঙ্কারপুরী	ঐ
ফুলের দেশের মেয়ে	প্রদীপকুমার চক্রবর্তী
বায়স্কোপের বাক্‌সো	বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত
বাঘুকে নিয়ে গপ্পো	সরল দে
রূপকথার রামধনু	বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত
রূপকথার মায়াপুরী	ঐ
রহস্যের সন্ধানে	আশাপূর্ণা দেবী
মহাকালীর মুণ্ডমালা	গৌতম রায়
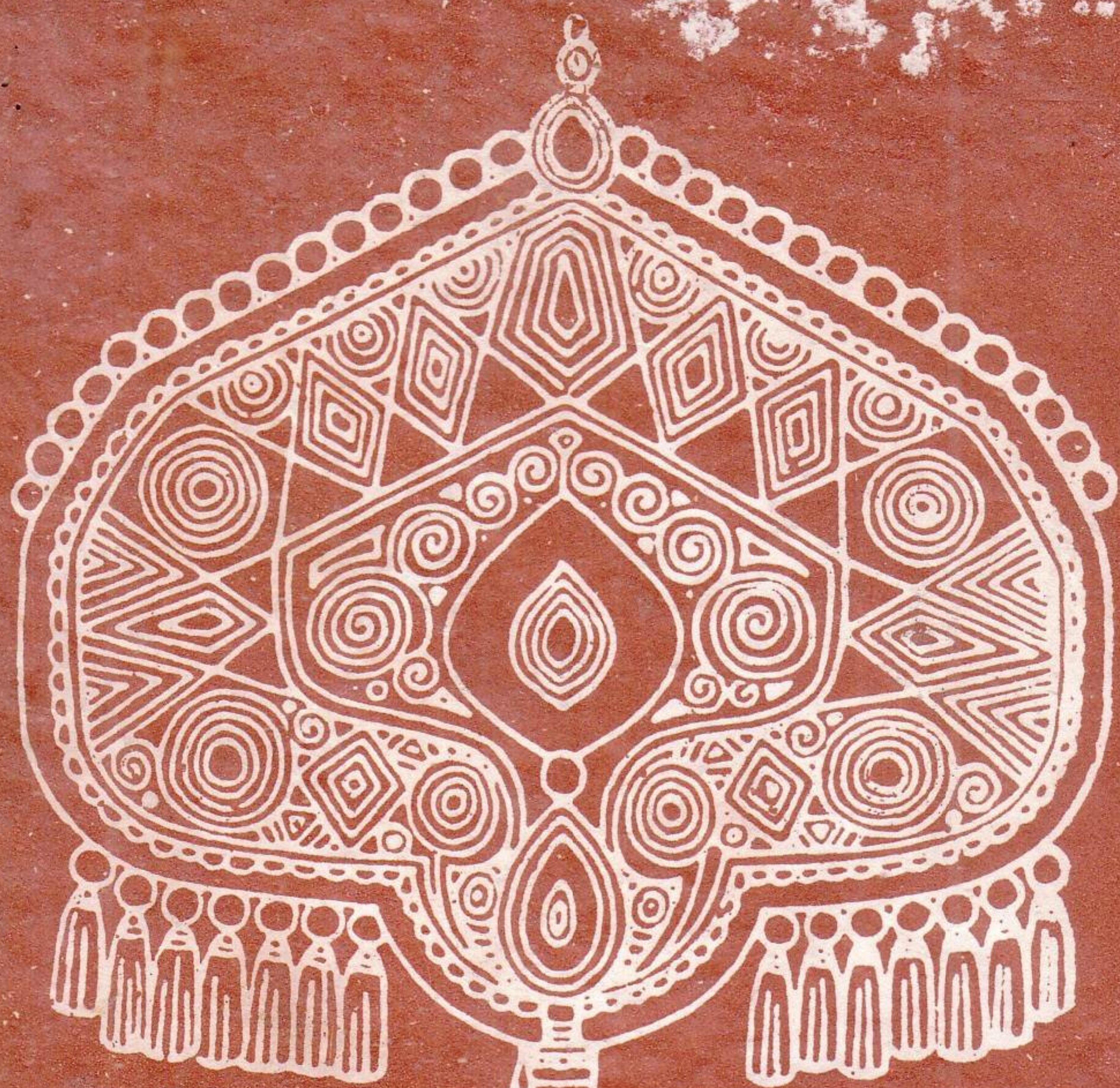
সুকুমার মানে নির্মল শিশু আর
রায় মানে রাজা
কিন্তু সুকুমার রায় শুধু
শিশুর রাজা নন, শিশু সাহিত্যেরও
তাই সর্বকালে সর্বযুগে
শিশু সাহিত্যের তালিকার
সবার উপরে

সুকুমার রায়

শিশু সাহিত্যের রাজা সুকুমার রায়ের
হাসি খুশির বই
পেয়ে আর দিয়ে সমান মজা
সুকুমার রায়ের বই
হাতে আসা মানে এক জাহাজ
সোনা নিয়ে ঘরে ফেরা